ডিকন্সট্রাকশন ডিকলোনাইজেশন

অজিত চৌধুরী
ত্রিদিব সেনগুপ্ত

১।। কাফকার পাঁচিল

আসুন, কাফকার 'দি গ্রেট ওয়ল অফ চায়না', চীনের মহাপ্রাচীর, থেকে আমরা ঝরা পাতা কুড়োই। যতটুকু, যেখান থেকে, যেমন আমাদের খুশি।

> ... অনেক অনেক ফাঁক রয়ে যেত। পরে, ক্রমে, ধীরে, তাদের ভরাট করা হত, খেপে খেপে, একটু একটু করে। কতকগুলো তো ভরাট হল, এমনকি, প্রাচীর সমাপ্তির সরকারি ঘোষণারও পর। লোকে তো বলে যে কতকগুলো নাকি কোনওদিনই ভরাট হয়নি। হয়ত, এটাও আর একটা রূপকথা। প্রাচীর নির্মাণ শুরু হওয়ার থেকে তো এমন কত রূপকথা গজিয়েছে। যা সত্যি না মিথ্যে তা কেউই কোনওদিন যাচাই করতে পারবেনা। অন্তত তার নিজের জীবনে, একার চোখে, একার বিচারে তো পারবেই না, পুরো নির্মাণটার যা ব্যাপ্তি। এবার চট করে কেউ বলতেই পারে, কেন — সবদিক থেকেই তো অনেক বেশি সুবিধে হত, নির্মাণটা একলপ্তে করলে, অন্তত, দুটো মূল ভাগে ভাগ করে যদি একলপ্তে করা যেত। দেওয়ালটা তো শেষ অব্দি, সারা দুনিয়ার লোক জানে, সবাইকে তাই বলাও হয়েছিল, উত্তরের লোকদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে বানানো। আর কী বাঁচাবে সেই প্রাচীর, যদি নিজেই সম্পূর্ণ না হয়, একটানা না হয়, মধ্যে মধ্যে যদি ফাঁক থাকে। বাঁচাবে তো না-ই, বরং একের পর এক বিপদ ডেকে আনবে। ধূ ধূ জনমানবহীন প্রান্তরে খাঁ খাঁ করতে থাকা খণ্ড খণ্ড দেওয়াল যেমন খুশি, যতবার খুশি ভাঙবে যাযাবর দস্যুরা। ...
>
> ... কিন্তু নির্মাণের কাজটা বোধহয় আর কোনো পদ্ধতিতেই করে ওঠা যেতনা। এটা ধরতে গেলে পুরোটা বুঝতে হবে — দেওয়ালটা সুরক্ষার কাজ করে চলবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে — তাই গৃহনির্মাণের প্রতিটি খুঁটিনাটি যত্ন, মানব ইতিহাসে এতাবৎকাল সঞ্চিত সমস্ত নির্মাণবিদ্যা, আর ছেদহীন দায়িত্ববোধ দিয়ে বানাতে হবে দেওয়ালটাকে। এছাড়া হবেনা, কিছুতেই হবেনা। ...
>
> ... কিছু না ভেবেচিন্তে হঠাৎ করে তো আর কাজে হাত দেওয়া হয়নি। প্রথম পাথরটা গাঁথার পঞ্চাশ বছর আগে থেকে নির্মাণবিদ্যা, বিশেষত স্থপতিবিদ্যাকে, চীনদেশের সমস্ত এলাকায়, যার চারদিকে দেওয়ালটা তোলা হবে, রাজবিদ্যা বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আর সমস্ত বিদ্যাচর্চার গুরুত্ব ততটুকুই যতটুকু তা দেওয়াল তোলায় কাজে আসে। ...
>
> ... কেউ নিশ্চয়ই আশা করেনা যে লোকালয়হীন পার্বত্য এলাকায়, বাড়ি ছেড়ে, ঘর ছেড়ে শ-শ মাইল দূরে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, ছেদহীন শেষহীন, পাথরের উপর পাথর তারা কেবল গেঁথেই চলবে, গেঁথেই চলবে। ওই কঠোর পরিশ্রম, যা তাদের দীর্ঘতম জীবৎকালেও শেষ হবেনা, তাদের হতাশার শূন্যতায় ঠেলে দিতে পারত। তার চেয়েও বড় কথা, যদি তাদের কর্মক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়! সেই কারণেই চালু হল এই খণ্ড খণ্ড করে নির্মাণের প্রথা। এই ব্যবস্থায় পাঁচশো গজের কাজ তো নামিয়ে ফেলা যায় মাত্র পাঁচ বছরেই। যদিও, তার ভিতরেই, একদম নিয়মমাফিক যেন, সুপারভাইজরদের হাল যেত খারাপ হয়ে — সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত — কোনো কিছুতে আর কোনো বিশ্বাস নেই, না নিজের উপর, না পাঁচিলের, না পৃথিবীর। তাই, নিয়ম করে, হাজার গজের প্রোজেক্টপূর্তির আনন্দ উৎসবের রেশ না মিলোতেই, তাদের চালান করে দেওয়া হত অনেক দূরে। যাওয়ার পথে তারা দেখতে পেত নানা দিকে বেড়ে উঠছে অংশে অংশে, খণ্ডে খণ্ডে, সোমত্থ সমাপিত দেওয়াল। দেখতে পেত হাইকমাণ্ডের কোয়ার্টার্স। তাদের পরানো হত

সম্মানসূচক পদক, ব্যাজ। কানে আসত দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে রোজই এসে পৌঁছতে থাকা নয়া নয়া সৈন্যদের হুল্লোড়। দেখত, জঙ্গল কাটা পড়ছে, দেওয়ালের ভারা বানানো হবে। দেখত পর্বতের শরীরে কাটাকুটি — দেওয়ালের ইঁটপাথর। হাওয়ায় ভেসে আসত মন্দিরের গাথাস্তোত্র, প্রার্থনাপরায়ণ পবিত্র পুরোহিতেরা পাঠ করছে, প্রাচীরের সমাপ্তির আকাঙ্খায়। এত সব, এত কিছু, হৃদয় জুড়োত, ধৈর্য্যপরায়ণ হত। কিছুটা সময় তারা কাটাত নিজের ঘরে, শান্ত, বল পেত শরীরে। যে নম্র নির্ভরতায় তার রিপোর্ট শোনা হত — যে দৃঢ় বিশ্বাস ওই সরল, ছাপোষা ভদ্রলোকটির, সবকিছুর পরও প্রাচীরের অবশ্যম্ভাবী সমাপ্তিতে — ফের আর একবার টানটান হয়ে উঠত তার স্নায়ু, পেশী, তন্ত্রী। বাচ্চাদের যেমন আশা আর ফুরোয় না, সে আর একবার বিদায় নিত ঘর থেকে, আরো একবার একবুক অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্খা — জাতির ওই প্রাচীরের জন্যে সে শ্রম দেবে।
ঘর থেকে রওনা দিত সময়ের আগেই। কত দূর অব্দি তাদের এগিয়ে দিতে সঙ্গে সঙ্গে যেত গ্রামের অর্দ্ধেক মানুষ। পতাকা উড়িয়ে, স্কার্ফ দুলিয়ে দলে দলে লোক, রাস্তা ঘাট সর্বত্র। আগে তো কখনো বোঝেনি তারা, এত বিরাট তাদের দেশ, এত তার বৈভব — না ভালোবেসে থাকা যায় এই দেশকে? ...
...তাই, এই সবের জন্যেই, এই খণ্ড-নির্মাণের সিদ্ধান্ত। কিন্তু, শুধু এই না, এর পাশাপাশি আরো কারণ আছে। ...
...মানুষের প্রকৃতি পদ্মপাত্রে জলের মত, স্বভাবগত ভাবেই অস্থির। কোনো বাঁধন, কোনো বাধ্যতাই মানতে পারেনা। যদিও বা বেঁধে ফেলে, অচিরেই শুরু হয় বাঁধনে বাঁধনে প্রবল টানাহেঁচড়ার পাগলামি। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে সমস্ত কিছু। সব। ওই দেওয়াল, ওই বাঁধন, তার নিজের অস্তিত্ব।
হতেই পারে যে এই সমস্ত ভাবনাচিন্তা, যা দেওয়াল নির্মাণেরই বিরুদ্ধে যায়, এদের উড়িয়ে দেয়নি হাইকমান্ড — খণ্ড-নির্মাণের ওই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। ...
... স্বচ্ছ সত দৃষ্টিতে তাকালে একথা সহজেই বোঝা যায়, হাইকমান্ড যদি চাইত, একলপ্তে নির-বিচ্ছিন্ন নির্মাণের পথে সমস্ত বাধাই জয় করে নিত। তাই, নির্দ্বিধায় একথা বলা যায়, পাঁচিলটাকে টুকরো টুকরো মাপে গেঁথে তোলার হাইকমান্ডের এই সিদ্ধান্ত ছিল সচেতন, স্বতঃপ্রণোদিত।...

কাফকার পাঁচিলের গল্প থেকে আর নয়। কাফকার কোথায়, এ তো আমাদেরি গল্প, উত্তর থেকে, উত্তরপশ্চিম থেকে, প্রতিরোধের পাঁচিল গড়ার। গল্পটা জাস্ট শুরু হল। তাতে আমরা একটু কাফকা লাগালাম। যতটুকু যেরকম কাফকা লাগবে, ততটুকুই নিয়েছি। মানে, কাফকা নিইনি। নিয়েছি, মানে পাকিয়ে তুলেছি, মর্জিমাফিক আমাদের নিজস্ব একপিস কাফকা।

ডাবলরোল সুনীল শেঠির একজনের আর শিল্পা শিরোদগরের বাচ্চা, গোপীকিষণ সিনেমায়, তারসপ্তকে চেঁচাচ্ছিল, মেরে দো দো বাপ, মেরে দো দো বাপ, মেরে দো দো বাপ ...। গোপীকৃষ্ণের এই পৃথিবীতে, গোঁফের তলা দিয়ে মুচকি হেসে আমরা বলি, আমাদের অগণন বাপ। কোনো এক এবং একমাত্র বাপকা নই আর, কাফকা এখন অনেক, বহুবচন, ইচ্ছেমতন আমরা বানিয়ে তুলি।

২।। দেরিদা বহুবচন

সমস্ত পিতারাই এখন বহুবচন। পিতৃ-উপস্থিতি বিরোধী দেরিদাও।

মার্ক্স-এঙ্গেলস-এর আঠেরশো ছেচল্লিশের সেই বিস্ফোরক এবং সেমিনাল পুস্তিকা — এই গ্রহে যা একটা নতুন সময়ের জন্ম দিয়েছিল — তার শুরুতেই ইউরোপ কমিউনিজমের প্রেত দেখছে। একটা প্রেত, এ স্পেকটার, একক প্রেতকে একবচনে দেখছিল ইউরোপ। আর উনিশশো তিরানব্বইয়ের এপ্রিলে, রিভারসাইডে, দেরিদাকে বক্তৃতা দিতে হল মার্ক্স-এর প্রেতদের নিয়ে। বহুবচন — স্পেকটারস অফ মার্ক্স।

যার ভূমিকায় সঙ্কলনের সম্পাদককে লিখতে হবে — মার্ক্স এবং মার্ক্সবাদ দুই-ই, ইতিমধ্যেই সদাসর্বদাই, অলওয়েজ অলরেডি, হয়ে দাঁড়িয়েছে বহুবচন।

কোনো দেরিদা দর্শন ঘরানার ছুঁৎমার্গী শুদ্ধাচারী কান্টবাদীদের। ক্রিস্টোফার নরিস ইত্যাদি।

কোনো দেরিদা মার্কিন সমালোচনাতত্ত্বের — এসো মা দেরিদা, মা-লক্ষ্মী, দেখো মা আমাদের বিজনেসের ঝাঁপ যেন বন্ধ না হয়। মার্কিন অ্যাকাডেমিকতার রণনীতির একটা আধুনিকতম প্রকৌশল। একটা টেক্সট নাও, তার সীমানা চেনাও, চেনাও তার গুরুত্বদানের মাপকাঠি। এবার গুরুত্বের তুলাদণ্ডটাকে জাস্ট একটু অন্যদিকে হেলাও — অর্থাৎ গজিয়ে তুলতে থাকো আর একটা টেক্সট, আর একটা পেপার ছাপাও, আমরা যাইনি মরে আজো, তাই কেবলি টেক্সট-এর জন্ম হয়।

আবার কোনো দেরিদা মিডিয়ার। সুপারস্টার দেরিদা। গ্ল্যামারাস। সাতানববই জানুয়ারির কলকাতা বইমেলার দেরিদা-ফাংশান থেকে বেরিয়ে কে একটা বলল, গুরুর গাল কী চমকাচ্ছিল দেখেছো!

আসুন আমরাও আমাদের নিজের নিজের দেরিদা বানাই। একটু একটু দেরিদা নেড়ে ঘেঁটে দেখি, আর নিজের মত করে রচনা করতে থাকি দেরিদার ভাষ্য। দেরিদা যখন নিজেই একটা টেক্সট। টেক্সট থেকে টেক্সটতরতা। নতুন নতুন টেক্সট। দেরিদার ডিকন্সট্রাকশন যেখানে নিজেই, নিয়তই, ইতিমধ্যেই সদাসর্বদাই, ডিকন্সট্রাক্টিত হতে থাকে। হচ্ছে। কোনো একটা ভাষ্যকেই শেষ চূড়ান্ত মোক্ষম বলে আর ঘোষণা করা যাচ্ছেনা। টেক্সট-এর অর্থের গণতন্ত্র। আমরা আমাদের দেরিদাকে চিনে নিচ্ছি, ভাঙছি, বেঁকাচ্ছি, পাকিয়ে তুলছি। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত একটা পল্লবগ্রাহিতায় আমরা শুধু সেটুকু দেরিদাকেই স্বীকার করছি যেটুকু দেরিদা আমাদের মধ্যেই ছিল।

আমরা জানি পৃথিবী বদলাচ্ছে। পৃথিবী একটা গ্লোব হয়ে যাচ্ছে। গ্লোবালাইজেশন। এই বদলাতে থাকা পৃথিবীর বদলাতে থাকা ইউরোপ নিয়ে দেরিদার লেখা — ইউরোপ দি আদার হেডিং। দেরিদা ইউরোপের দিকনির্দেশ খুঁজছেন, দিকভ্রষ্ঠতাকে নির্দিষ্ট করছেন। ইউরোপ যখন শুধু আর ইউরোপ থাকতে পারছেনা। অপর-কে বাদ দিয়ে ইউরোপকে আর ভাবা যাচ্ছেনা। ইউরোপ বদলে যাচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে, তার স্পেসিং, তার অল্টারিটি। ইউরোপ আর ইউরোপের অপর দুজনেই তাদের নিজেদের অস্তিত্বে নিজেদের নিজস্ব বর্গের দিফেরঁস-এ ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে।

আমরা, যারা ইউরোপের সেই অপর, আমরা কোন দেরিদাকে খুঁজি? কী এসে যায় আমাদের, আসল দেরিদাটা ঠিক কী বস্তু তা নিয়ে? দেরিদা নিজেই যেখানে ভাঙছেন, ভাঙতে চাইছেন আসলত্বের কৌলীন্যপ্রথাকে, পিতৃ-উপস্থিতিকে, লোগোস-কে, ক্ষমতাকে।

আমরা যারা তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক লড়াইয়ের মিছিলে রাজপথ বদলে যেতে দেখেছি বারবার, মার্ক্সবাদ এবং বামপন্থা নিয়ে যারা ঘুমিয়েছি এবং জেগেছি, ক্রেমলিনের মাথা থেকে নামানো লালপতাকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন ভেঙ্গে যেতে থাকা সীমানা যাদের বিভিন্ন স্বপ্ন এবং প্রেমের মিউরাল বদলে দিয়েছে বারবার, তারা, আমরা, ইউরোপের সেই অপর, কেন আর একটা দেরিদাকে খুঁজবনা — আমাদের কাস্টমবিল্ট দেরিদা?

আমরা যারা রোজ আমাদের চারপাশে ভেঙ্গে যেতে দেখছি চেনা লড়াইকৌশলের চেনা ব্যূহগুলোকে, কেন নতুনতর ব্যূহের সন্ধান খুঁজবনা আমাদের দেরিদা-এডিশনে? দেরিদার দিফেরঁস-এ কেন আমরা খুঁজবনা আমাদের অস্তিত্ব আর জ্ঞানতত্ত্বের প্রতিমুহূর্তে বিশ্লিষ্ট কর্তিত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার একটা নয়া ইতিহাস, যেখান থেকে হয়তো তাকানো যেতে পারে নতুন রকম লড়াইয়ের একটা নয়া ব্যাকরণের দিকে।

দেরিদা প্রেত দেখাচ্ছেন। অজস্র মার্ক্সপ্রেত। ইউরোপকে পশ্চিমকে বিদ্যার কেন্দ্রকে প্রেত দেখাচ্ছেন দেরিদা। প্রেত — সে আছে — কোথাও রয়ে যাচ্ছে — পশ্চিমের, ইউরোপের বাইরে — সেই প্রেতের কণ্ঠস্বরকে। অন্য উত্তরআধুনিকরা ভুলে থাকছেন সেই নির্বাক জন-আধিক্যের ভার-কে, অন্ধকারকে (বদ্রিলার)। তাই আমরা, যাদের প্রেতচ্ছায়ে ঘোরাফেরা, আমরা চিনে নিতে চাই আমাদের দেরিদাকে। এই

চিনে নেওয়ার পথে আমাদের পুঁজিও বড় সীমিত। মার্ক্সকে একটু একটু আগে থেকেই চিনি আমরা। আর অল্পসল্প হেগেল আলথুসের গ্রামশি।

হাসেরল্, হাইডেগার, লেভিনাস এবং ইত্যাদি, যাদের থেকে দেরিদা শুরু করেছেন, এরা আমাদের তৃতীয় বিশ্বের হাটুরে মার্ক্সিস্টদের কাছে বড্ড দূরের এক জগৎ। এই সব অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া নয়, আমরা আমাদের মধ্যেই বসবাস করা, ইতিমধ্যেই সদাসর্বদাই পরিচিত দেরিদাকে নির্মাণ করতে চাইছি। আমাদের কাজের জন্য দেরিদায় অনুপ্রবেশ হতে পারে তিন কায়দায়।

১।। জনপ্রিয় লোক-আলোচনা (গুঞ্জন এবং গুজব) থেকে একটা দেরিদা তৈরি করে নেওয়া।

২।। ডিকন্সট্রাকশনের অনুশীলনের অভিজ্ঞতার ইতিহাস থেকে খাড়া করে তোলা দেরিদা-কায়া।

৩।। মূল এবং নির্ভেজাল দেরিদাকে সম্যক উপলব্ধি এবং রূপারোপ।

তৃতীয়টাকে আমরা নাকচ করেছি আগেই, আমাদের কাছে মূল এবং নির্ভেজাল বলে কিছু হয়না, কিছু নেই। আমরা কাজ করব প্রথম দুটোকে মিলিয়ে। এই জন্যে আমরা শুরু থেকে শুরু করব — ফার্দিনান্দ দি সাসুর।

৩।। অনির্ভেজাল দেরিদা

সাসুর বলেছিলেন শব্দদের নামকরণ-এ, অর্থাৎ, ওই নির্দিষ্ট শব্দ হয়ে ওঠার ভিতর কোনো আভ্যন্তরীণ লজিক নেই। পদ্ধতিটা কাকতালীয়। 'কুকুর' 'কুকুর' না হয়ে 'ঠাকুর', আর 'ঠাকুর'-ও তাই ওই না হয়ে ওই, মানে 'কুকুর', হতেই পারত। জলজ্যান্ত কুকুরতা, সেই চিহ্নকারী ভূমি, যার চিহ্ন 'কুকুর' নামের শব্দ, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই ওই চিহ্নের, 'কুকুর' নামক শব্দের।

তাই রেফারেন্ট স্পেস বা চিহ্নকারী ভূমির বর্গীকরণ — যে পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের চতুর্পার্শ্বস্থ বাস্তবতাকে আমাদের ভাষায় প্রকাশ করি, বিভিন্ন সত্তা-কে চিহ্নিত করি বিভিন্ন শব্দে — শব্দদের নামকরণের প্রক্রিয়ার ভিতর যে পদ্ধতিটা নিহিত, সেটাও একই সঙ্গে এলোমেলো এবং কাকতালীয়। অর্থাৎ চিহ্নীকরণ এবং বোধ-এর প্রক্রিয়ায়, শব্দ থেকে অর্থ তৈরির পদ্ধতিতে ওই নাম/শব্দ/ধারণা সবগুলোই আপতিক। শব্দ এবং তার অর্থের কোনো আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নেই।

অর্থ উদ্ভূত হয় শব্দগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের থেকে। 'কুকুর' নামক শব্দ *কুকুর* এই অর্থ প্রকাশ করতে পারে 'ঠাকুর', 'মুগুর' ইত্যাদি অন্যসব আপামর শব্দকুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত অবস্থায়। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের দরুন — সম্পর্কিত-পার্থক্য — ডিফারেন্স-ইন-রিলেশন। এবং, লক্ষ্য করুন, বিভিন্ন চিহ্ন অর্থাৎ শব্দগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক মূর্ত হয়ে ওঠে নেতিকরণের আধারে। কুকুর কী যা কিনা ঠাকুর নয়/ঢেকুর নয়/মুগুর নয়/মাগুর নয় ... না না না চীৎকার করে যাওয়া, অনন্তে মিশে যাওয়ার, অর্থাৎ কিনা শিয়ালদা ইস্টিশনে বনগাঁ লোকাল এসে যাওয়ার আগে অব্দি। এইসব নেতিকরণ দ্বারা সংজ্ঞায়িত সমস্ত সম্পর্ক মিলে এক হয়ে ওঠে চিহ্নীকরণের পুরো প্রক্রিয়াটার ভিতর। তৈরি করে একটা সমগ্র — আকার পায় — গজিয়ে ওঠে টেক্সট।

সাসুরের ধারণায়, শুধুমাত্র লাল রংটাকেই দেখিয়ে যাওয়া, এই রংবাজি যতবারই করা হোক না কেন, কোনোদিনই একটা বাচ্চাকে লাল রং চেনাতে পারবেনা। খোকা বা খুকুটি লাল চিনতে শেখে নিতান্তই নীল সবুজ হলুদ ইত্যাদি রং-এর প্রতিপরিচয়ে — অর্থাৎ লাল কী? — না, যা কিনা নীল নয়, সবুজও নয়, হলুদ হওয়ার তো কোনো সিনই নেই।

সাসুরের চিন্তায় সমগ্র একটি সসীম সান্ত ধারণা, অন্তবন্ত সেই আবদ্ধ সমগ্রে লীলারত পার্থক্যেরা সম্পর্কিত-পার্থক্য। সেই সমগ্রের প্রতিটি এককই পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। আর, সান্ত বা সসীম

এই অর্থে যে তাদের সংজ্ঞা গড়ে তোলা যায় ওই সমগ্রের অভ্যন্তরেই। এখানে আমরা সমগ্রের হেগেলীয় এবং আলথুসারীয় ধারণার সঙ্গে সাসুরের এই সমগ্রের একটা প্রতিতুলনা আনতে পারি।[১]

[১] হেগেলের লজিকে কোনো বর্গের সংজ্ঞা পাওয়ার জন্যে আমাদের লাফাতে হয়। একটা লিপ। একটা উত্তরণ। ইন্দ্রিয় ডিটারমিনেট বিয়িং-এর কাল এবং ভূমি, টাইম এবং স্পেসের বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করে দেয়। যে বিশিষ্টতার বাইরে ওই ডিটারমিনেট বিয়িং অনস্তিত্ব। এই ডিটারমিনেট বিয়িং, যারা ইমিডিয়েট রিয়ালিটিকে নির্মাণ করে, এদের বর্গীকরণ সম্ভব। এই ইমিডিয়েট রিয়ালিটির অভ্যন্তরে কিছু ডিটারমিনেট বিয়িং নিতান্তই সন্নিকটবর্তী — তারা 'এই' বা দিস এবং অন্যরা 'ওই' বা দ্যাট। 'এই' বা দিস বা ইমিডিয়েটকে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে রিয়ালিটি। হেগেল যার টেকনিকাল নাম দিলেন বিয়িং-বাই-সেল্ফ। আর 'ওই' বা দ্যাট বা আদারস-কে বলা হচ্ছে নিগেশন, রিয়ালিটির নিগেশন। যার টেকনিকাল নাম বিয়িং-ফর-অ্যানাদার। ধরা যাক, আমরা একটা অরণ্যে রয়েছি। একটা গাছকে, এই সামনের গাছটাকে বললাম দিস, তাকে নিগেট করল আর একটা গাছ বা তার নিগেশন বা বিয়িং-ফর-অ্যানাদার। যে গাছ তখন দ্যাট। সেই গাছকে, সেই দ্যাট গাছকে আবার নিগেট করল আর একটা গাছ। তাকে নিগেট করল আর একটা গাছ। ......। এরকম চলল। এই অনন্তকাল ধরে নিগেশন চলতে থাকাকে হেগেল বললেন ব্যাড ইনফিনিটি। বললেন, এইভাবে কোথাও পৌঁছনো যায়না। হেগেল আরো বললেন যে বুঝতে গেলে, কোথাও পৌঁছতে গেলে একটা উত্তরণ — একটা লিপ ঘটানোর প্রয়োজন পড়ে। উত্তরণ বা লিপের মাধ্যমে একটা বর্গ বা ক্যাটিগরিতে পৌঁছতে হয়। সেই ক্যাটিগরি যা দিস এবং দ্যাট উভয় ডিটারমিনেট বিয়িংকেই ধারণ করে, ইনক্লুড করে। দিস এবং দ্যাট-এর পরবর্তী সেই ক্যাটিগরি হল বিয়িং-ফর-সেল্ফ, যা বিয়িং-বাই-সেল্ফ এবং বিয়িং-ফর-অ্যানাদার এই দুই বর্গের একটা সংশ্লেষণ — সিন্থেসিস। এই পরবর্তী উচ্চতর বর্গ বা ক্যাটিগরিতে পৌঁছনোর ক্রিয়াটাই নামকরণ — লেবেলিং বা নেমিং। অরণ্যের দিস বা এই ডিটারমিনেট বিয়িং-কে নিগেট করল দ্যাট বা ওই ডিটারমিনেট বিয়িং। দিস এবং দ্যাট উভয় ডিটারমিনেট বিয়িং-কে অন্তর্গত করে আমরা পেলাম একটি উচ্চতর বর্গ — গাছ। দিস-ও একটা গাছ। আবার দ্যাট-ও একটা গাছ। এই 'গাছ' একটা নাম, নেম, লেবেল। আমরা এই বর্গটির নাম বা লেবেল 'গাছ' না দিয়ে 'দ্রিঘাংচু'-ও দিতে পারতাম। অর্থাৎ, নেম বা লেবেল বা নামটির একটি কাকতালীয়তা বা অ্যারবিট্রারিনেস থাকে। বর্গটি তা বলে কাকতালীয় নয়। দিস⟶ দ্যাট⟶ দ্যাট১⟶ দ্যাট২⟶ দ্যাট৩⟶... এই পদ্ধতিকে হেগেল বলছেন ব্যাড ইনফিনিটি, এভাবে কোথাও পৌঁছনো যায়না। হেগেল বলবেন ট্রু ইনফিনিটিতে পৌঁছতে হয় একটা লিপের মাধ্যমে। লিপ করে, উত্তরণের ভিতর দিয়ে, আমরা একটা বর্গ, ক্যাটিগরিতে পৌঁছই। একটা বর্গীকরণ, একটা নামকরণ। বিভিন্ন শব্দ। শব্দ যা ভাষা। ভাষা একটি সামাজিক অস্তিত্ব। সমাজ ভাষার শব্দগুলিকে তাদের নিজস্ব অর্থ দিয়েছে। প্রত্যেকটা শব্দের নিজস্ব অর্থই শব্দের পিছনে বস্তুর নিজস্ব জগত, প্রেক্ষাপট, কন্টেক্সট থেকে আহরিত। কন্টেক্সট, পরিপ্রেক্ষিত বদলালেই অর্থ বদলায়। বৈদিক ব্রাহ্মণরা জৈন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের 'পাষণ্ড' বলতেন, তখন 'পাষণ্ড' একটা বিশেষ্য। হাজার দুয়েক বছর বাদে 'পাষণ্ড' বিশেষণ হয়ে গেল। তার পরিপ্রেক্ষিত, কন্টেক্সট বদলানোর কারণে। পরিপ্রেক্ষিত বলতে অন্যান্য বস্তুনিচয়, যাদের ভিতর উদ্দীষ্ট বস্তুও অন্যতম। অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তুলনায় আমরা চিনি এবং বুঝি একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে। তার নাম দিই। নেমিং। তাই নেমিং-কে ডিটারমিন করে তুলনার জগত। বস্তুজগত যা বস্তুর কন্টেক্সট। ডিফারেন্স/নিগেশন দিয়েই আমরা কোনো বস্তুকে বুঝি, রিকগনাইজ করি। নেমিং-এর পদ্ধতি, যা বস্তুত অ্যারবিট্রারি বা কাকতালীয়, আসলে একটি বহিষ্করণ, এক্সক্লুশনের পদ্ধতি। একটি নাম/লেবেল/নেম বস্তুকে তার আওতায় এনে অপরাপর বস্তুকে এক্সক্লুড করে। নেমিং-এর অর্ন্তভুক্তির এই পদ্ধতিটা একই সঙ্গে একটা বহিষ্কারের পদ্ধতি। আমরা কোনো বস্তুকে চিনি অন্য বস্তুদের তার বর্গ থেকে বহিষ্কার করতে করতে। আমি 'লাল' নামটা দিতে পারি 'নীল' 'হলুদ' 'সবুজ' এইসব বর্গ, ক্যাটিগরি, নাম আছে বলেই। 'নীল' 'হলুদ' 'সবুজ' — এই প্রেক্ষাপটেই 'লাল' লাল হয়ে ওঠে। আমরা বুঝি নিগেশনের ভিতর দিয়ে 'লাল' — মানে যা 'নীল' নয় / যা 'হলুদ' নয় / যা 'সবুজ' নয় —

একটা বিষয় লক্ষ্য করুন — একটা সমতার ধারণা প্রথম থেকেই নিহিত আছে সাসুরের কাঠামোয় প্রস্তাবিত সমগ্রের বিভিন্ন উপাদানের ভিতর — অর্থাৎ টেক্সট-এর অন্তর্বর্তী শব্দগুলোর ভিতর। সাসুরের

নেতিকরণের শৃঙ্খল, চেইন অফ নিগেশন — ব্যাড ইনফিনিটি, হেগেল বলেছেন, আমরা জানি। তার বদলে, হেগেল, সঙ্গে আমরাও, লাফালেন। লিপ। এবং, একটা ক্যাটিগরিতে পৌঁছলেন — যার নাম 'লাল'। যা লাল রঙের সমস্ত বৈচিত্রকে একই বর্গের মধ্যে, 'লাল' নামক বর্গের মধ্যে ধারণ করল, এবং 'নীল' 'হলুদ' 'সবুজ' দের বহিষ্কার করল। এই 'লাল' ক্যাটিগরিটাই হেগেলের বিয়িং-ফর-সেল্ফ। চারপাশের ইমিডিয়েট রিয়ালিটি হল বস্তু থেকে বস্তুতে পার্থক্যের — ডিফারেন্সের জগত। সেখান থেকে আমরা পৌঁছলাম নেম-এ। যা একটা ইউনিটি। যার একটা নির্দিষ্ট কোয়ালিটি বা গুণ আছে। যে কোয়ালিটির কম বা বেশি, কোয়ান্টিটি এবার সূচিত করল নতুন ডিফারেন্স। ডিফারেন্ট বিয়িংস — আমরা ডিফারেন্স থেকে শুরু করেছি। তার থেকে আমরা ইউনিটিকে প্রোডিউস করলাম। ডিফারেন্স থেকে ইউনিটি থেকে ডিফারেন্স থেকে ইউনিটি থেকে ...। এরকম করতে করতে শেষ অব্দি ইউনিটিতে পৌঁছব। যখন মোট বাস্তবতার টোটালিটিকে আমরা ডাকব ইউনিভার্সাল বলে। যার পর আর এগোনো যায়না। হেগেল এটাকে ইতিহাসের সমাপ্তি — এন্ডপয়েন্ট অফ হিস্ট্রি বললেন। হেগেলের 'ফিলোজফি অফ রাইট ' হেগেলের মডেলের একটা চমৎকার উদাহরণ। হেগেলের টোটালিটি এবং ডিফারেন্সের ধারণার। জাতি, নেশন স্টেট একটা টোটালিটি। যার অভ্যন্তরে বিচরণ করছে প্রতিটি ব্যক্তি-অধিকার — মাই রাইট। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে। ডিফারেন্স। তাদের ইউনিটি এইখানে যে তারা প্রত্যেকেই বহন করছে 'রাইট' নামক ধারণাকে। একটি পরিব্যাপ্ত অ্যাবস্ট্রাক্ট বোধকে। সমস্ত মাই-রাইট গুলো এখানে একত্রিত। তারা সিভিল সোসাইটি গঠন করছে। ইউনিটি। নেশন স্টেট এখানে ইউনিভার্সাল। যা ধারণ করছে ডিফারেন্স এবং ইউনিটি দুটোকেই।

অন্যদিকে, সমগ্রের আলথুসারিয় ধারণা প্রশ্ন করে ডিফারেন্সকেই। আলথুসারপন্থীরা যেকোনো বর্গ বা ক্যাটিগরিকেই দেখেন একটা একটা পদ্ধতির আকারে। যদিও পদ্ধতি বলতে ঠিক কী বোঝানো হয় তা স্থানভেদে বদলায়। তাই ডিফারেন্সও একটা পদ্ধতি। এবং এই পদ্ধতি হল তিনটি উপ-পদ্ধতির ফলশ্রুতি। যাদের নাম ইকনমিক, পলিটিকাল এবং কালচারাল। এবং এদের ভিতর কাজ করে অতিনির্ণয় — ওভারডিটারমিনেশন — ফ্রয়েডের অ্যানালিসিস অব ড্রিমস থেকে পলিটিকাল ইকনমিতে আমদানি করা ধারণাগুলোর একটা। দুটি সত্তা 'ক' এবং 'খ' কে আমরা তখনই বলব অতিনির্ণয়ে আছে যখন 'ক' এবং 'খ' উভয়ই পরস্পর পরস্পরের দ্বারা নির্ণীত এবং নির্মিত। কোনো একমুখী শাসন নেই। তাই ইকনমিক কালচারাল এবং পলিটিকাল এদের তিনজনের কেউই কারো গুরুঠাকুর নয়। আবার কেউই স্বাধীনও নয়। প্রত্যেকেই অন্য প্রত্যেকের পরাধীন। এই জায়গাটায় চিরাচরিত মার্ক্সবাদের সঙ্গে আলথুসারিয় তত্ত্বের একটা গুরুতর প্রভেদ ঘটে গেল। যেখানে পলিটিকাল বা কালচারাল নিশ্চিতভাবেই ইকনমিকের মুখাপেক্ষী। আলথুসারিয় তত্ত্বে এই তিনটি পদ্ধতির সীমা, তাদের সংজ্ঞা, তত্ত্বকাটামোগতভাবেই অস্পষ্ট। এখানে একটা সহজ রেফারেন্স হিশেবে মাথায় আসতে পারে হাইডেগারের বিগ-বিয়িং-এর কথা যা সংজ্ঞাগতভাবেই সু-রাতুর, আন্ডার-ইরেজার, অবলোপমান। এদের একটা কাজ-চালানো গোছের সংজ্ঞা দিতে গেলে সেটা এরকম দাঁড়াবে — ১) ইকনমিক মানে দ্রব্য এবং সেবার উৎপাদন/বন্টন/আত্তীকরণ। ২) পলিটিকাল মানে ক্ষমতার উৎপাদন/বন্টন/আত্তীকরণ। আর ৩) কালচারাল মানে ব্যুৎপত্তি/অর্থের উৎপাদন/বন্টন/আত্তীকরণ। ইকনমিক কালচারাল এবং পলিটিকাল, — এরা সকলে মিলে, অস্তিত্ব-তত্ত্বের, অন্টলজির তলে অবস্থান করে একটা সমগ্রের অভ্যন্তরে। একটা ধূসর সমগ্র। যার প্রতিটি বিন্দু সাদা-কালোর স্পষ্টতায় চিহ্নিত নয়। এখানে একটা খুব ছোট্ট অথচ কূট উপসংহার যোগ করার থাকে — আলথুসেরের নিজেরি অনালথুসারিয় হয়ে যাওয়া নিয়ে — আলথুসের নিজেই যোগ করেছিলেন, সমস্ত আন্তঃক্রিয়ার পর চূড়ান্ত বিন্দুতে, ইন দি লাস্ট ইনস্টান্স, ইকনমিকই নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্রকে। অর্থাৎ, প্রকৃত প্রস্তাবে, আলথুসের ফেরত গেলেন মার্ক্সবাদের চালু ঘরানায়। কেন? হয়তো আলথুসেরের আত্মজীবনী 'দি ফিউচার লাস্টস এ লং টাইম' এর প্রথম কয়েকটা সেকশন এর কোনো ইঙ্গিত দিতে পারে।

সম্পর্কিত-পার্থক্য গোড়া থেকেই ধরে নেয় যে শব্দগুলো, বা সেই ধারণাগুলো, শব্দরা যাদের চিহ্ন, তাদের গুরুত্বের নিরিখে সমান। কোনো ক্রম বা হায়েরার্কি নেই। এই সমতা বা সমগুরুত্ব সাসুরের তত্ত্বের আভ্যন্তরীণ নয়, এন্ডোজেনাস নয়। এমন নয় যে সাসুরের তত্ত্বের কোনো দার্শনিক প্রস্তাবের দ্বারা তাদের সমান করে তোলা হয়েছে। সাসুরের তত্ত্ব তার যাত্রা শুরু করে এদের সমান ধরে নিয়ে। এই সমতা সাসুরের তত্ত্বকাঠামোর কাছে বহিরাগত, এক্সোজেনাস। প্রদত্ত।

এবং এই হল গল্পের সেই মোচড় যেখানে আমরা ছোট সংসার সুখী সংসারের পতিপত্নীর অভ্যন্তরে একটা ছোট্ট ওহ্-কে ঢুকিয়ে দিয়ে নাটকীয় সব ঘাপলা জেনারেট করতে চাইছি। ঢুকিয়ে দিতে চাইছি দেরিদাকে। মানে, ইয়ে, ঠিক দেরিদা না, আমরা যে দেরিদাকে চিনি। খোদ পারির সরবোনের একোলের অধ্যাপক খোদ দেরিদার বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলার নেই। অ্যাডালটারির অভিযোগ নিতান্তই আমাদের দেরিদার নামে, যে আর আন-অ্যাডাল্টারেটেড নেই — যে এখন অনির্ভেজাল দেরিদা।

আমাদের এই দেরিদা যামিনী রায় খচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত প্লাবিত সুখী সংসারে ঢুকে আসে, মুচকি হেসে বলে, অল ইজ নট ওয়েল, বা, সামথিং ইজ রট্ন্, ইত্যাদি ইত্যাদি। জানায় যে আপাতস্বচ্ছ জলে, আপাতসমান ওই শব্দযূথের অভ্যন্তরে, প্রকৃত প্রস্তাবে, একটি ঘোলাটেপনা রয়ে যায়, একটি ছিপা হুয়া ক্রমবিন্যাস, হায়েরার্কি।

দেরিদোপনিষদের ভাষ্য মোতাবেক, টেক্সট-এর গভীরে আছে এবং রয়ে যায় নানা হায়েরার্কি, গুরুত্বের ক্রমভেদ — শব্দ এবং ধারণা-গুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের ভিতর। কোনো বা কোনো কোনো শব্দ/ধারণা শাসক, অন্যরা তাদের শাসনের অধীনস্থ। এই মূল শাসক শব্দরা, টেক্সট-এর সমগ্র-র আধারে, একটা কাঠামো হাজির করে, অর্থনির্মাণের পদ্ধতির একটা ধরতাই, যার তালে তালে, সেই সুরে, অর্থবান হয়ে ওঠে অন্যান্য শব্দরা। মূল শব্দ/ধারণা-র নেতৃত্বে, এই ফলত-অর্থবান অধীনস্থ শব্দরা, সতত, মড়কের ইঁদুরের মত ঘাড় গুঁজি, টেক্সট-এর আঁধারঘুঁজির বুকে ঘুমিয়ে থাকে। টেক্সট-এর অভ্যন্তরস্থ ভূমির এবার খণ্ডীকরণ ঘটে। মূল শাসক শব্দদের জন্য অর্থের আলোকিত রাজপথ, পুরোভূমি। আর অন্ধকার পশ্চাৎভূমি অধীনস্থ অন্তজ শব্দকুলের।

টেক্সট-এর মূল ভূমির এই জাতিখচিত খণ্ডীকরণ — এটাই কনটেক্সট, পরিপ্রেক্ষিত। টেক্সট পাঠের কন্টেক্সট । রচনা পাঠের প্ররোচনা। অ্যাডাল্টারিপ্রবণ আমাদের এই বেজাত দেরিদা প্ররোচনা দেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে?

আর আঁধারকন্দরে নিদ্রা যায় যে শব্দরা, তারা আসলে অপেক্ষারত। জিয়নকাঠির যাদুর প্রতীক্ষায়। ছোঁয়ানো মাত্রই একবার হাট গমগম, সঙ্গে সঙ্গে ভাঙে, এই নাও জল থইথই, এই নেই জল গাঙে। শিকারের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে বসে আছে নিদ্রিত পশ্চাৎভূমি। কন্টেক্সট বদলের। এই কন্টেক্সট বদলেরই আর এক নাম ডিকন্সট্রাকশন, যদি এই বদলের খেলাটা খেলা হয় সচেতন সিদ্ধান্তে, ডেলিবারেটলি।

টেক্সট-এর দেরিদীয় পাঠ মানেই একটা টেক্সট-কন্টেক্সট কমপ্লেক্স। একটা কৌতূহল স্বাভাবিক ভাবেই গজিয়ে ওঠে এখান থেকে। টেক্সট এবং কন্টেক্সট এর পারস্পরিক সম্পর্কটা ঠিক কী রকম? অথচ আশ্চর্য, দেরিদা এই বিষয়টায় সম্পূর্ণ নির্বাক। দেরিদোপনিষদের একটা স্তোত্রও বিন্দুমাত্র আলোকপাত করেনি এই এলাকাটায়। সমগ্র দেরিদা-শাস্ত্রের একটা চূড়ান্ত খামতি এই যে টেক্সট-কন্টেক্সট-আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে কোনো বোধগম্য সামগ্রিক তত্ত্ব সেখানে নেই।

দেরিদার পুরো তত্ত্বটাই কেন্দ্রীভূত টেক্সট-এর জগতে, সেখানকার শাসক এবং শাসিত শব্দ/ধারণাদের ভিতরকার ক্ষমতার রাজনীতি নিয়ে। টেক্সট এবং কন্টেক্সট এর পারস্পরিক অতিনির্ণয়, যদি কিছু সেরকম থেকে থাকে, তার সম্পর্কে লেশমাত্র কোনো ইঙ্গিত নেই দেরিদায়। টেক্সট-পাঠের সাসুরীয় পদ্ধতির ভিতর অনুপ্রবেশ করছেন দেরিদা, কন্টেক্সট প্রসঙ্গে, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবেই চুপ করে যাচ্ছেন। কিন্তু বহু কিছুই আছে, অন হেভেন অ্যান্ড আর্থ, জ্ঞানতত্ত্বের এপিস্টেমলজিকাল স্বর্গে বা অস্তিত্বতত্ত্বের অন্টলজিকাল এই পৃথিবীতে, বহু কিছুই করার আছে টেক্সট এবং কন্টেক্সট-এর আভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিষয়ে। যা দেরিদায় করা হয়নি।

এই সেই এলাকা, সদাসতর্ক সীমানাপ্রহরার বাইরে, নিম্নআয়িক নরনারীর প্রাত্যহিক ধর্ষণের বাইরে। বিএসএফ আর কী-ই বা করে? এই ধর্ষণই দেশপ্রেম হয়ে যায়, যখন, ভাগ্যক্রমে, ওই নারী হয় বিধর্মী, বাংলাদেশ, পাকিস্থান বা কাশ্মীরের। বিএসএফ বাঁচিয়ে আমরা ঢুকে পড়ছি দেরিদায়। অরক্ষিত এলাকা, যেমন লাস্ট ফ্রন্টিয়ার পেরিয়ে 'বসা-ষাঁড়' আর তার মত অনেকে গেছিল শীতের বরফে ঢাকা পাউডার নদীর দিকে, কানাডায়, স্বপ্নের দেশে, মার্কিন বাফেলো বিলের বা তার বাচ্চাদের বুলেট এড়িয়ে। কারুর মৃত্যুর সময় তার সঙ্গীরা যেখানে নিদেন মৃত্যুসঙ্গীতটুকু গাইতে পারবে।

৪।। বিস্মৃত শব্দগুলি

একটু ছোট করে একটান ঝালিয়ে নেওয়া যাক। সাসুরের জায়গা থেকে দেখলে টেক্সট-এর একটা বিশেষ নির্দিষ্ট এবং স্বতন্ত্র অর্থ থাকেই। কিন্তু এই অর্থটি আপতিক, অর্থাৎ, শব্দ/ধারণা-দের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত। এই সম্পর্ক কাজ করে কিছু নাম-এর এবং তাদের আন্তঃসম্পর্কের একটা কাঠামোর আধারে — এই কাঠামোর বাইরে এই অর্থের কোনো অস্তিত্ব নেই।

বিপরীতে দেরিদা জানালেন যে প্রকৃত প্রস্তাবে একক চূড়ান্ত এবং সত্য অর্থ বলে কিছু হয় না। হয় অর্থেরা — বহুবচন, অনেক, তুঞ্জ তুঞ্জ।

সাসুর থেকে দেরিদায় যাত্রার ঘাট-আঘাটাগুলো অনেকটা এইরকম

১।। নামকরণের প্রক্রিয়াটা কাকতালীয়।

২।। তাই মোট ভূমি-র/বাস্তবতা-র নামকরণ-ভিত্তিক বর্গীকরণটাও কাকতালীয়।

এই দুটো প্রস্তাবই আমরা সমর্থন করছি, এবং এর সঙ্গে আমরা যোগ করছি আরো একটা।

৩।। কন্টেক্সট সদাসর্বদাই বনাওটি, নির্মিত। পাঠকের পাকিয়ে তোলা।

এই অতিরিক্ত প্রস্তাবটির দ্বারা আমরা আমাদের দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করতে চাই কন্টেক্সট-এর জীবিত ভূমিকার উপর — যা দিয়ে কন্টেক্সট শব্দ/ধারণা-দের একটা ক্রমবিন্যাসে বিন্যস্ত করে:—

১।। প্রাথমিক বা এলিট শব্দ

২।। উপজাত বা ডিরাইভড শব্দ

৩।। বিস্মৃত শব্দ[২]

বিকল্প কনটেক্সট উঠে আসে টেক্সট-এর নিজস্ব যুক্তির ব্যাকরণ মেনে, পাঠক বা সাবজেক্ট বা বিষয়ী-র কোনো তোয়াক্কা না-রেখেই। নতুন কনটেক্সট এবং আরো আরো নতুন কনটেক্সট গজিয়ে ওঠে, গজাতে থাকে, টেক্সট-এর লজিক মোতাবেক। এখানে পাঠক কোথায় — সাবজেক্ট?

---

[২] বিস্মৃত শব্দরা নিজেরা হারিয়ে যায় স্মৃতির সীমান্তের ওপারে, শুধু রেখে যায় তাদের পদচিহ্ন। যার ইন্টারপিলেশনে, আলথুসের কথিত সেই পদ্ধতিতে, জানা অংশের অনুবর্তনে অজানা অংশগুলোকে জাগিয়ে তুলে তুলে, আমরা ডেকে আনতে পারি আকস্মিক আঘাত। আমাদের চেনা ডিসকোর্স চেনা বিদ্যাভূমি চেনা এপিস্টেমরা যে আঘাতের জন্য তৈরি নয়। 'মাতৃভূমি' শব্দটাকে ভাবুন। প্রতিটি মানুষ 'মাতৃভূমি' শব্দটাকে ভাবে তার মায়ের আদলে। ডিসকোর্সটাকে ফেলুন একজন বেশ্যার সন্তানের সামনে। সে পড়ছে একটা টেক্সট। তাতে 'মাতৃভূমি' শব্দটা রয়েছে। আমাদের বিদ্যাচর্চারা কতটা সংনম্য? তারা কি হজম করে উঠতে পারবে এই অভিঘাত — কতটা বেঁচে থাকবে 'মাতৃভূমি' শব্দের মহিমা অজানা আঙিনায় — সেই বেশ্যাবাড়ির উঠোনে? এই বেশ্যাভূমি মাতৃভূমি হল সেই বিস্মৃত শব্দ — এইচআইভি-তাড়িত পশ্চিম আর তার মুদ্রা ও সিগনালজীবী এনজিওরা আকস্মিকভাবেই আবিষ্কার করেছে, কী অদ্ভুত, তৃতীয় বিশ্বে দেখি অনেক বেশ্যা, কী ভয়ানক, এইডস যে ছড়িয়ে পড়বে বাধাবন্ধহীন — তাদের খোলা ইস্কুলে, এইডসবিরোধী প্রচার পাঠের প্রস্তুতিতে, চোখ কচলে জেগে ওঠা বেশ্যার বাচ্চারা পাঠ করছে, ম-এ আ-কার, ত-এ ঋ-কার, ভ-এ ঊ ... — পিছনের ঘরে, আবছা আলোয়, সামনের ঘরে তার মা, তার মাতৃভূমির মডেল তখন ব্যস্ত তার প্রাত্যহিকতায়। বিস্মৃত হোন।

আমাদের উদ্দেশ্য একটু ভিন্ন — লজিকের ছদ্মবেশে সাবজেক্টকে, বিষয়ীকে, ঢুকিয়ে আনা। একটা সাবজেক্ট যে কেবলই নতুন দৃশ্যের জন্ম দেবে, নতুন কন্টেক্সটের। এখানে একটা কূট এবং সঙ্গত প্রশ্ন তোলাই যায় — লজিকের, যুক্তির ভিতরকার যুক্তিগত কেলো কী করে যুক্তির মাধ্যমেই দেখানো যাবে? মাধ্যমটা নিজেই তো নিজের অস্বচ্ছতা হয়ে দাঁড়াবে। এই খ্যাঁচাকল থেকে বেরোনোর জন্যে আমরা নিয়ে আসছি অতিনির্ণয়।

টেক্সট এবং কন্টেক্সট দুজনে দুজনার দ্বারা অতিনির্ণীত — অর্থাৎ নির্ণীত এবং নির্মিত। এবং, আমাদের এই প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য — এই দ্বিমুখী সম্পর্কের কেবলমাত্র একটি দিক — কন্টেক্সট দ্বারা টেক্সটের নির্ণয়। এর ফলাফলও খুবই মোক্ষম। আমাদের দেরিদা-ব্যাখ্যা শব্দ/ধারণাদের শোভন সুষম পরিমিত পৃথিবীকে তছনছ করে দেয়। এই ভাষ্যে কন্টেক্সটই ঠিক করে দেয় শব্দ/ধারণাদের অসমান স্তরবিন্যাস। হায়েরার্কিতে তাদের স্থান। তাই উপজাত বা ডেরিভেটিভ শব্দ, যারা প্রাথমিক বা এলিট শব্দদের থেকে উত্তরাধিকারে পায় তাদের অর্থ, তাদের অর্থও যায় বদলে। কন্টেক্সট বানিয়ে দেয় নতুন মাঠ — এসো খেলাধুলো করো নিজেদের ভিতর — এসো হে কুলীন, এসো হে পতিত, হও উপনীত — এসো হে প্রাথমিক এবং উপজাত শব্দেরা — এলিট এবং সাবঅল্টার্ন শব্দেরা। আর এই পারস্পরিক ক্রীড়া এবং ক্রিয়া থেকে গজিয়ে ওঠে গাদাগাদা সাপ্লিমেন্ট — দেরিদা যেমন সাপ্লিমেন্ট গজানোর কথা বলেছিলেন।

আসুন এবার আমরা দেখি কাকে বলে সাপ্লিমেন্ট। আমরা দেরিদার সাপ্লিমেন্ট-তত্ত্ব পড়ব হেগেলের লজিকে, যুক্তিবিজ্ঞানে অনুপ্রবেশ করতে করতে। তার আগে আমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার আমরা এটা পড়তে চাই কেন।

৫।। সাবঅল্টার্নঃ অব্রবীৎ — বচনমব্রবীৎ ?

যতদূর সম্ভব এই পৃথিবীর প্রাচীনতম রিডিং বিটুইন দি লাইনস ক্রিটিকাল ক্রিটিসিস্ট টেক্সটপাঠ 'গূঢ়ার্থদীপিকা'-য়, মধুসূদন সরস্বতী, গীতাবর্ণিত কুরুক্ষেত্রে "দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীত" এই অংশের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "আচার্য্যং দুর্যোধনঃ অব্রবীৎ ইতি এতাবতৈব নির্বাহে বচনপদং সংক্ষিপ্তবহ্বর্থত্বাদিবহুগুণবিশিষ্টে বাক্যবিশেষে সংক্রমিতম্।" — দুর্যোধন আচার্যকে বললেন এইটুকু মাত্র বললেই তো চলত, তাও ফের যে আবার 'বচন' শব্দটা ব্যবহার করা হল তা সংক্ষিপ্ত বহুঅর্থবিশিষ্ট করে তুলল কথাটুকুকে। "বচনমাত্রমেব অব্রবীৎ, কঞ্চিদর্থমিতি বা।" অথবা দুর্যোধন কতকগুলো অর্থহীন কথা বলেছিলেন আচার্য দ্রোণকে। হয়ত টেনশনে।

সাবঅল্টার্নের প্রসঙ্গে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের প্রশ্ন ছিল — ক্যান দি সাবঅল্টার্ন স্পিক? স্পিভাককে নকল করে, আমরা জিগেশ করছি — অধীনস্থ অনুগত অংশ, সাবঅর্ডিনেট সেক্টর কি কথা-বলে উঠতে পারে, পোস্টকলোনিয়াল পরিস্থিতিতে?

পোস্টকলোনি মানে একটা সিন্থেটিক স্পেস, কৃত্রিম ভূমি — থার্ড বা হাইব্রিড স্পেস-ও বলেছেন কেউ কেউ।[৩] যেখানে ওভারডিটারমিনেশন, অতিনির্ণয়টা নিজেরি একটা মিমিক্রি হয়ে দাঁড়িয়েছে — একটা

[৩] সরল যৌগিক এবং কৃত্রিম এই তিন বর্গে ভূমির প্রকারভেদটা নির্দিষ্ট করা যায় গ্রামশির প্যাসিভ রেভলিউশনের আলথুসারিয় আলোচনার সঙ্গে তুলনায়। আলথুসারের ওভারডিটারমিনেশন বা অতিনির্ণয়ের মাপকাঠিতে যদি বিচার করি, গ্রামশির প্যাসিভ রেভলিউশনের ফল হল সিন্থেটিক ভূমির নির্মাণ। একটা ডিসকার্সিভ স্পেস, বোধগত আলোচনাগত ভূমি — নিয়ত যেখানে মডার্নিজম আর ট্র্যাডিশন, আধুনিকতা আর ঐতিহ্যের পারস্পরিক অতিনির্ণয়ের খেলা চলছে। সেই খেলায় নিরবচ্ছিন্নভাবে পরপর ঘটে চলেছে মেটাফোরিক আর মেটোনিমিক বদল। মেটাফোরিক বদল বলতে আমরা বোঝাতে চাইছি এমন অবস্থাকে যখন মূলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে তার সরাসরি একজন বদলি যে তার চেয়ে ন্যূন নয়, গুরুত্বে তার সমান। আর মেটোনিমিক বদল মানে প্রতিনিধি মূলের চেয়ে ছোটো, খাটো, ক্ষুদ্রতর। রাজার জায়গায় রাজদণ্ড। এই দ্বিপাক্ষিক খেলা খেলতে খেলতে দোস্ত দোস্ত না রহা, পেয়ার পেয়ার না রহা, আধুনিকতাও আর

খেলা খেলা দেখনাই অতিনির্ণয়, যেখানে অতিনির্ণয়ের অংশীদাররা পরস্পর পরস্পরকে সমানভাবে নির্ণয় এবং নির্মাণ করেনা, পারস্পরিক সম্পর্কটা অসমান। কেন্দ্র যেভাবে পরিধি-কে নির্মাণ ও নির্ণয় করে, পরিধি সেভাবে কেন্দ্রকে করতে পারেনা। কেন্দ্র পরিধিকে শাসন করে মেটোনিম দিয়ে, পরিধি তার প্রত্যুত্তর দেয় মেটাফোর-এ। সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ ঘরানার আলোচনায়, বা স্পিভাক তাকে যেভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে, ক্ষমতার সম্পর্ক মানেই একটা একমুখী স্রোত। বশীকরণের একটা ওয়ান-ওয়ে-ট্রাফিক: এলিট থেকে সাবঅল্টার্ন, কুলীন থেকে ব্রাত্য। কখনো কুলীন বলতে পুঁজি, মজুরি শ্রম তখন ব্রাত্য। শ্রেনী, জাতপাত, চামড়ার রং, সামাজিক ক্ষমতার ক্রমভেদে আপেক্ষিক অবস্থান ইত্যাদি অনেক কিছুই আসতে পারে কৌলীন্যের আর ব্রাত্যতার মাপকাঠি হিশেবে।

প্রশ্নটা হল — এই কুলীন-ব্রাত্য ছকটা ধূসর, না সাদা-কালো অক্ষরে স্পষ্ট — কতটা ধূসর এই পাণ্ডুলিপি?

স্পিভাকের প্রশ্নটাকে আর একবার আমরা উচ্চারণ করছি — এবার একটা পোস্টকোলোনিয়াল, উত্তর-উপনিবেশ উপত্যকায়। যদিও, আমাদের সাবঅল্টার্ন অনেক ধূসর। স্পিভাকের ব্রাত্যের মত ঝকঝকে, বিজ্ঞাপন-স্পষ্ট, শার্প-ইন-ফোকাস নয়। আমাদের টম ডিক অ্যান্ড হ্যারি, অমল বিমল এবং কমলকে গ্রাস করছে ডিকন্সট্রাকশন ডিকলোনাইজেশন। 'হ্যারি ডিকন্সট্রাক্টেড' ফিল্মে যেমন চারপাশের প্রতিটি জিনিষ ব্যক্তি পরিপ্রেক্ষিত সবকিছু স্পষ্ট নিখুঁত — এককথায় স্বাভাবিক। আর নায়ক তার ফোকাস হারিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ ক্যামেরা। চারপাশের স্পষ্ট সবকিছুর ভিতর হ্যারি ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ঘোলাটে বহিঃরেখা নিয়ে।

এই আউট-অফ-ফোকাস সাবঅল্টার্নকে আমরা ডাকছি স্যাভেজ বলে। 'স্যাভেজ' শব্দটার ইংরিজি বানানটা ভাবুন। এস এ ভি এ জি ই। মধ্যের ভি এ অংশটাকে বাদ দিলে পড়ে থাকে সেজ। আমাদের এই স্যাভেজ তার বুকের গভীরে বহন করে বেড়ায় একজন ঋষিকে, তার অর্ন্তদৃষ্টি ও জ্ঞান, তাঁর চৈতন্য।

সাবঅল্টার্নের কথা-বলার প্রসঙ্গে ফেরত আসা যাক।

পৌরাণিক মার্ক্সবাদ, যা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে, সাবঅল্টার্নের কথা তার হয়ে বলে দেওয়ার দায়িত্ব ন্যস্ত করে তার একমাত্র বৈধ স্বামী কমিউনিস্ট পার্টির উপর, বুক ফাটে তাও মুখ ফোটেনা, আহা বেচারা অবলা। লেনিন বলেছিলেন যে, কথা বলার জন্যে প্রয়োজনীয় চৈতন্য শ্রমিকশ্রেনীর, ওয়ার্কিং ক্লাসের, নিজের থাকেনা। বাইরে থেকে আনতে হয়। ওয়ার্কিং ক্লাস কনশাসনেস ইজ ব্রট টু দি ওয়ার্কিং ক্লাস ফ্রম উইদাউট। কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে বহিরাগত তত্ত্বকে আত্তীকরণ করে সাবঅল্টার্ন, ওই তত্ত্ব তার

আধুনিকতা থাকছেনা, ঐতিহ্যও আর ঐতিহ্য থাকছেনা। কিন্তু, প্লিজ, মাথায় রাখবেন ওই দুধরনের খেলার অসমতার জায়গাটাও। একই ক্রীড়ায় একজন ক্রীড়ক আর একজন ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অতোটা কেলো যদি নাও ঘটে, অ্যাট লিস্ট দুজনে বদলাচ্ছে দুই ভাবে। দুজনই দুজনকে অতিনির্ণয় করছে। কিন্তু সেই অতিনির্ণয় সমান না। যেমন গনতন্ত্রে উই আর অল ইকোয়াল বাট সাম আর মোর ইকোয়াল দ্যান দি আদারস। আধুনিকতা এবং ঐতিহ্যের ক্রীড়ার এই ভূমিটাকেই আমরা ডাকছি কৃত্রিম ভূমি, সিন্থেটিক স্পেস বলে। যা গ্রামশি-আলোচনার পরিচিত বর্গ যৌগিক ভূমি, কমপ্লেক্স স্পেস থেকে আলাদা। গ্রামশি-আলোচনায় যৌগিক ভূমিকে আলাদা করা হয় সরল ভূমি থেকে। সরল ভূমি একটা সহজ ক্রটিহীন হেগেলিয় সমগ্র। এই সমগ্রে আধুনিকতা নামক থিসিস (যার আধার স্টেট, সিভিল সোসাইটি) তার অ্যান্টিথিসিস ঐতিহ্যকে দেখে নিচু চোখে, দেখে তার নিজের রিজন-এর, যুক্তিবোধ এবং বিজ্ঞানমনস্কতার প্রতিবন্ধক হিশেবে। এদের আন্তঃক্রিয়ায় নির্মিত হয় সিন্থেসিস — নেশন স্টেট, জাতি। এর বিপরীতে, চালু গ্রামশি-আলোচনায়, যৌগিক ভূমি হল একটা পরিবর্তিত ক্ষেত্র, আধুনিকতা আর ঐতিহ্যও এখানে পরিবর্তিত। সরল ভূমির মত তারা আর বিশুদ্ধ ক্যাটিগরি নেই। সঙ্গত স্বাভাবিক হেগেলিয় সমগ্রটি আর নেই। তার জায়গা নিয়েছে সারোগেট ইউনিভার্সাল, বদলি সমগ্র। কিন্তু, লক্ষ্য করুন, আধুনিকতা আর ঐতিহ্য এখানেও চিরাচরিত হেগেলিয় রকমে অ্যান্টাগনিস্টিক, পরস্পরবিরোধী। যা আমাদের কৃত্রিম ভূমি, সিন্থেটিক ভূমির ক্ষেত্রে আর সত্যি নয়।

বাচনে পরিণত হয়। গ্রামশি বলেছিলেন ভুয়ো চৈতন্য, ফল্স-কনশাসনেস-এর কথা। এই ফল্স কনশাসনেস-কে বানিয়ে তোলে পুঁজি, পুঁজির বাস্তবতার প্রতি মানুষের সামাজিক-সম্মতি নির্মাণ করতে। টু ম্যানুফ্যাকচার কনসেন্ট। গজিয়ে ওঠে সাবঅল্টার্নের সারোগেট স্পিচ, পরিবর্ত বক্তব্য। এবার সে বলে ওঠে বদলি কথা — এই কথা চেয়েছিল বুঝি? — মনের কথা প্রাণের কথা বলা আর তার হয়ে ওঠেনা। হয়ে ওঠেনা সোনার বলের মত সূর্য আর রুপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা। সে শুধুই বচনমাত্রমেব অব্রবীৎ, কশ্চিদর্থমিতি বা।

সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ স্কুল ধরে নেয় যে সাবঅল্টার্ন কথা বলবে বৈকি, আলবৎ বলবে, বলতে হবে তাকে। ইতিহাসে ভূগোলে গপ্প-উপন্যাসে বারবার বলেছে। তার কথার ছায়াপাত ঘটেছে নানাকিছুতে। সে শুধু বচনম্ অব্রবীৎ নয়। অর্থ তাতে বাস্তবিকই ছিল — সেই অর্থকে শুধু রিড বিটুইন দি লাইনস করতে হবে, পাঠ, পুনঃপাঠ, মর্মপাঠ করতে হবে। যে কাজের দায়িত্ব সাবঅল্টার্ন ঐতিহাসিকের। মিশেল ফুকোর কাজগুলো কথা বলে উঠতে চেয়েছে সমাজের শাসিত শ্রেনীর নানা অংশের হয়ে — জেলখানার কয়েদি, হাসপাতালের চিকিৎসাধীন রোগী — কোনো না কোনো ভাবে যে পতিত, আলাদা, স্বতন্ত্র — ডেভিয়ান্ট।

আজকের ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিকদের কেউ কেউ চেষ্টা করছেন সাবঅল্টার্নের, ব্রাত্যের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ থেকে, তার কাছ থেকে নেওয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আর এক ধরনের জ্ঞান ও বিদ্যার কাঠামো খাড়া করতে। এটা একটা যান্ত্রিকতা, রিডাকশনিজম, এসেনশিয়ালিজম, খর্বীকরণ। সাবঅল্টার্ন অস্তিত্বকে খাটো করে, নামিয়ে এনে, সমান করে তোলা তার কিছু চিহ্নের সঙ্গে। যেন, এবার থেকে, ওই চিহ্ন = সাবঅল্টার্নতা। হেগেল যেমন তার তত্ত্বে বাস্তবতাকে সমগ্রকে বুঝেছিলেন একমাত্র একেশ্বর এসেন্সের, পরমব্রহ্মের রূপে।[৪]

স্পিভাক মনে করেন যে সাবঅল্টার্ন কথা-বলে উঠতে পারেনা। বলো না একবার কথা, বলে দেখো! রাস্তা বদল হবে মাঝরাতে, কালোগাড়ির ভিতর কালোগাড়ি এসে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে। নিয়ে যাবে তোমার কথাকে। তারপর সুদৃশ্য সুদৃশ্যতর প্যাকেটে করে হার্ড বা সুলভ মলাটে বেচে দেবে দোকানে দোকানে, লাইব্রেরিতে, আর অ্যাকাডেমিতে, পুরস্কারে এবং সচেতনতায়। এটা সম্ভাবনা নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হল যে কেউ তোমায় শুনবেই না, কানই দেবেনা তোমার কথায়। সাবঅল্টার্ন ঐতিহাসিক ইতিহাস লিখবেন সাবঅল্টার্নের আর ক্ষমতা সেই ইতিহাস পড়বে সাবঅল্টার্নকে আরো নিখুঁত ভাবে শাসন করার কায়দাকানুন রপ্ত করতে। একবার কথা বলে ফেলা তৈরি করে দেবে আরো আরো কথা বলতে না-পারাকে।

স্পিভাকের যুক্তি কাজ করেছে তিনটে ধাপে — যারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে জড়িত :—

---

[৪] মডার্নিজমকে পোস্টমডার্নিজমের সবচেয়ে বড় সমালোচনার জায়গাটাই হল এই খর্বীকরণ, একটা জলজ্যান্ত পদ্ধতিকে, যার নিজের একটা অবয়ব, ব্যাকরণ, এবং সবচেয়ে বড় কথা একটা ইতিহাস আছে, ইতিহাস যা বদলায়, নামিয়ে আনা একটা বা কয়েকটা ভ্যারিয়েবলে। এই ভ্যারিয়েবলের উপস্থিতি মানে ১, আর অনুপস্থিতি মানে ০ — পোস্টমডার্নদের আপত্তি এই জায়গাটাতেই — কোনো পরিবর্তনশীল ইতিহাসমান পদ্ধতিকে নামিয়ে আনা এই বাইনারিপনায়। একটা অতিসরলীকৃত উদাহরণ খাড়া করা যায়, মার্ক্সবাদী রাজনীতির শ্রেনী এই ধারণাটির সম্পর্কে। ধরুন শ্রমিকশ্রেনী। এবার যদি শ্রমিকশ্রেনীকে শ্রমিক-হওয়া নামক বাইনারি চলরাশিতে নামিয়ে আনা হয়, অর্থাৎ কেবলমাত্র শ্রমিক-হওয়া নামক চলরাশি সমান ১ হলেই সে শ্রমিকশ্রেনীর অংশ, নতুবা, ০ হলে, নয়। এটাই রিডাকশনিজম, খর্বীকরণ। বা এসেনশিয়ালিজম। হেগেল যেমন পুরো বাস্তবতাটাকে ধরতে চেয়েছিলেন তার সার, অন্তর্বস্তু, এসেনস-এর নিরিখে, যেখানে এসেনসই ভিত্তি, বস্তুজগতের আর সমস্ত কিছু, সমস্ত থিং, সব অ্যাপিয়ারেন্স, সবই সেই এক সার এসেনস-এর প্রকাশ, শাইনিং ফোর্থ।

- পূর্ব/দক্ষিণ[৫] — যাকে স্পিভাক সাবঅল্টার্ন বলে ডাকছেন — তার এসেনশিয়ালিস্ট বর্গের আকারে, যখন তাকে বোঝা হচ্ছে একটা বিশেষ্য, নাউন হিশেবে, ভাবা হচ্ছে একটা বস্তু বা রক্তমাংসের একজন ব্যক্তির আকারে, কিছুতেই কথা বলে উঠতে পারেনা। কারণ ক্ষমতা হয় তার কথাকে আত্তীকরণ করে নিজের কাজে লাগায়, নয় আদৌ শোনেনা। স্পিভাক একটা উদাহরণও দিয়েছেন যেখানে সাবঅল্টার্ন তার কথা বলেছিল এবং তার সেই কথা হারিয়ে গেছিল শূন্যতার গর্ভে, যেমন লিওতারের দিফেরঁদ-রা যায়, কারণ, লোকে তার কথায় কান দেয়নি।
- স্পিভাক নিয়ে আসেন দেরিদাকে। সাবঅল্টার্ন সাবজেক্ট পোজিশন, ব্রাত্য-অবস্থানকে, এই বিশেষ ভূমিকায় বিষয়ী-সংস্থাপন-কে, সেই বিষয়ীর দৃষ্টিকোণকে ব্যাখ্যা করতে। যে দৃষ্টিকোণ ব্রাত্যের। এই দৃষ্টিকোণকে, এই বিষয়ী-অবস্থানকে স্পিভাক দেখছেন এলিটের টেক্সট-এ কিছু শূন্যস্থান হিশেবে। তাকে জানা মানে এই অন্ধকার শূন্যস্থান থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে নিয়ে আসা। এই প্রসঙ্গে তিনি দেরিদাকে আনছেন ফুকো তথা দেল্যুজ-গুতারির প্রতিতুলনায়। বিপরীত বিন্দু হিশেবে। ফুকো আর দেল্যুজ-গুতারিকে স্পিভাক সোপর্দ করছেন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অংশ হয়ে ওঠার। মার্জিনে বসবাসকারী মানুষের মনকে আত্তীকরণের, উপনিবেশীকরণের, কোলোনাইজেশনের উপায় খুঁজে দেওয়ার।
- সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ-এর অবস্থান এবং প্রস্তাবগুলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা মাথায় রেখে দেরিদার ডিকন্স্ট্রাকশনের বিভিন্ন কায়দাকানুন কাজে লাগানোর কথা বলছেন স্পিভাক। এবং এবার এমন একটা কাঠামোয় যা এসেনশিয়ালিস্ট নয়।

ক্ষমতার ব্যাকরণ বিষয়ে চালু আলোচনাগুলোয় সাবঅল্টার্ন সাবজেক্ট পোজিশন, ব্রাত্য-বিষয়ী-অবস্থান যেন একটা স্বশাসিত এলাকা — সমস্ত খর্বীকৃত চিহ্ন-নির্ভর ব্রাত্য ধারণা এবং মননগুলো খেলা করে বেড়ায় এই স্বয়ংসম্পূর্ন স্বশাসিত এলাকায়। আবার কুলীনের চিন্তার রীতিবিধিকেও গাঁথা হয় এই একই এসেনশিয়ালিস্ট রকমে। এসেনশিয়ালিস্ট এই অর্থে যে এই মডেলে চৈতন্য তথা মনন স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, একটা স্বয়ংসম্পূর্ন বিশুদ্ধ সত্তা।

তাই, এই ধারণা মোতাবেক সাবঅল্টার্ন বা ব্রাত্যও একটা থিং-ইন-ইটসেল্ফ — একটা নাউন যার একটা স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন সংজ্ঞা আছে। চালু মডেলগুলোয় সাবঅল্টার্ন সাবজেক্ট পোজিশন, ব্রাত্য বিষয়ী অবস্থান, এই বিশেষ্যর গা বেয়ে গজিয়ে ওঠে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন স্পষ্টতায়। তাদের থেকে ঠিকরে পড়ে বিশুদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বশাসিত স্বাধীন ব্রাত্য চেতনার জগত। এই জগতের বিশুদ্ধ দ্বর্থহীন ভাষা-য় খচিত হয় এই জগতের সম্পর্কনিচয়। আবার, খেয়াল রাখুন, কুলীন বা এলিটের জগতও তাই, তার সম্পর্কও তাই, তাই ভাষাও, ওই একইরকম দ্ব্যর্থহীন, স্পষ্ট, স্বয়ংসম্পূর্ণ। ক্ষমতার ব্যাকরণ বিষয়ে চালু তাত্ত্বিক আলোচনা এই ভাবেই দেখে পুরোটাকে।

স্পিভাক সাবঅল্টার্নকে ফিরে দেখতে চাইলেন একটা আইডেন্টিটি-ইন-ডিফারেনশিয়াল, — একটি বিশেষ ধরনের আলোচনার ক্ষেত্র, ডিসকার্সিভ স্পেস-এর আকারে। যার চারপাশে স্পিভাক তার তাত্ত্বিক পৃথিবী নির্মাণ করছেন। যাকে স্পিভাক খাড়া করছেন একদিকে দেরিদা আর অন্যদিকে ফুকো এবং দেল্যুজ-গুতারির তুলনামূলক বিচারের সাপেক্ষে।

ফুকো এবং ফুকোর মত অন্যান্য পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীদের বিষয়ে স্পিভাকের নালিশ আত্মসন্তুষ্টি। আর পশ্চিমী এই আত্মসন্তুষ্টির সঙ্গে তাল মেলায় পূর্বের বুদ্ধিজীবীদের কোলাবোরেশন, মুৎসুদ্দিপনা। পোস্টকোলোনিয়ালিটি চর্চার একটা চালু বিষয় এটা — কীভাবে এলিট নিজেকে সাজিয়ে তোলে যেন উদ্ধারকর্তা, আর শেষ অব্দি আবিষ্কার করা যায় সেও পশ্চিমের ভৃত্য, চামচা-সিরিজে নবতম। প্রথম বিশ্বের

[৫] পূর্ব বা দক্ষিণ দুইই চিহ্নিত করছে একটা ব্রাত্য অবস্থানকে। নর্থ/সাউথ তো গণমাধ্যমের চালু প্রকরণ — উন্নত এবং অনুন্নত দেশকে বোঝাতে। আর উন্নত পশ্চিম তো পশ্চিম হয়ে ওঠে কেবলমাত্র একটা পূর্বের সাপেক্ষেই।

বুদ্ধিজীবীর এই সন্তুষ্টি আর তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের চামচাবাজি — এই দুটো মিলিয়ে যে সমাহার তাকে গায়ত্রী স্পিভাক খারাপ বলছেন। নৈতিক ভাবে খারাপ। আর নৈতিক ভাবে ভালো হল সেই অবস্থা যেখানে ওই সন্তুষ্টি বা মুৎসুদ্দিপনা কিছুই নেই।

এই দুই দল — আত্মসন্তুষ্ট পশ্চিম এবং মুৎসুদ্দি পূর্ব — দুই ধরনের বুদ্ধিজীবীদেরই কাঠগড়ায় তুলছেন স্পিভাক — প্রত্যক্ষে হোক বা পরোক্ষে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে অংশগ্রহনের নালিশে। নৈতিকভাবে এটা খারাপ কারণ এই সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াপদ্ধতি কাজ করে বলপ্রয়োগ এবং বশ্যতা দিয়ে।

পরাধীন ব্রাত্যের জন্য স্পিভাক সাবঅল্টার্ন বিষয়ী-সংস্থানকে নতুন রকমে ব্যবহার করার কথা বলছেন। 'অথরিটেটিভ ট্রুথ অফ দি টেক্সট', স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসাবে নয়। 'কট ইন দি গেম অফ নলেজ অ্যাজ পাওয়ার' — জ্ঞানের বকলমে ক্ষমতার খেলা হিশেবে নয়। ওভাবে দেখতে গেলেই সাবঅল্টার্ন প্রকৃত প্রস্তাবে হয়ে দাঁড়ায় এলিটের আয়না, এলিটের চিন্তনে জাত, এলিটের ভূমিতে বিধৃত এবং বিবৃত। সত্য-সাবঅল্টার্নতা সতত সঞ্চরমান সলিল-শৈবালের মত, ধরতে গেলেই পিছলে যাচ্ছে, হায়। তাই ওই সত্য-সাবঅল্টার্ন সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের আরব্ধ হতে পারেনা। খুঁজতে হবে ওই সত্য-সাবঅল্টার্ন বা আদর্শ সাবঅল্টার্ন থেকে বাস্তবতা কতটা চ্যুত হচ্ছে তার নিরিখে।

একটা নির্দিষ্ট সাকার সসীম সান্ত সংজ্ঞা হিশেবে সাবঅল্টার্নের অনুপস্থিতি — এই ঘাপলাটাই আমাদের অভ্যস্ত সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ প্রকরণের ঠিক উল্টো। খেয়াল করুন — স্পিভাক এখানে একটা স্বশাসিত সত্তা, অটোনমাস অন্টলজিকাল ভূমিকে জাস্ট বাতিল করছেন। নাকচ করে দিচ্ছেন। সত্তাকে অপসারণ করে টিকিয়ে রাখছেন একটা সংজ্ঞাকে। একটা আদর্শ, অর্থাৎ, একটা জ্ঞানতত্ত্বগত বর্গ, একটা এপিস্টেমলজিকাল ক্যাটিগরিকে। একটা আদর্শের আকারে সাবঅল্টার্ন আছে, কিন্তু রক্তমাংসে, শরীরী অবয়বে তাকে ধরা সম্ভব না। আছে লেখার রচনার টেক্সট-এর অভ্যন্তরে, তাত্ত্বিক উপাদান হিশেবে। এই উপাদান একটা বিশেষ্য, যা বেঁচে থাকে আখ্যানে। এ নাউন ইন ফিকশন।

আমাদের স্পিভাক-পরিক্রমা শেষ। গত চারটে সেকশন জুড়ে দেরিদা এবং স্পিভাকের এই আলোচনায়, কখনো কখনো সাসুর হেগেল আলথুসের এবং গ্রামশির উল্লেখ মিলিয়ে, আমাদের হাতে সবগুলো তাত্ত্বিক যন্ত্রপাতিই প্রস্তুত যা দিয়ে আমরা এবার সেই সাবঅল্টার্নের আলোচনায় যেতে পারি যে আখ্যানের বিশেষ্য, যে কথা বলতে পারেনা। এর মানে কখনোই এই নয় যে সাবঅল্টার্ন কথা বলতে পারেনা কারণ কথা-বলা বলে কিছু হয়না — বলা নামক ক্রিয়াটাই একটা মিথ্যা স্বচ্ছতা, স্বচ্ছতার মায়া সৃষ্টি করে, কিন্তু, আসলে কিছুই দৃষ্টিগোচর করেনা, কিছুই জানায় না। সেই অর্থে কোনো ডিসকোর্স কোনো টেক্সট কোনো রচনাই কথা বলতে পারেনা। এই কথা-বলতে না-পারা এই অর্থে যে সাবঅল্টার্নের কোনো ভূমিই নেই, কোনো ভূমি, এমনকি আত্মপরিচয়ের ভূমিটুকুও। সাবঅল্টার্ন এই নামে ম্যাক্সিমাম যা বোঝা যেতে পারে তা হল একটা ডিসকার্সিভ ক্যাটিগরি — আলোচনার একটি বর্গ। মননের, অধ্যয়নের, রচনার। বাস্তবতার নয়।

তাই, স্পিভাকের এই সাবঅল্টার্ন কথা বলতে পারেনা। কোনোক্রমে বলে উঠলেই ক্ষমতা তার বলা সেই কথাকে কাজে লাগিয়ে নেয়। বলাটা পর্যবসিত হয় গভীরতর একটা না-বলায়। আর তার এই বলার লিপিলিখন যে করে, যে ডিকটেশন নেয়, সে হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতার স্তাবক। সাবঅল্টার্নের কথা-বলার এই অসম্ভাব্যতা ঘোষণা করার পর স্পিভাক নিয়োজিত হন তার নিরাকরণে, প্রতিবিধানে, প্রত্যাদেশে। এক্ষেত্রে স্পিভাকের প্রস্তাবিত রণনীতি হল ডিকন্সট্রাকশন। একটি এলিট টেক্সটকে এলিট যেভাবে পড়ে, পড়তে গিয়ে যে বর্গগুলোকে যেভাবে ব্যবহার করে তাদের শীর্ষাসীন করার, উল্টে ফেলার, উল্টে ফেলতে ফেলতে একটা সাবঅল্টার্ন বিষয়ী-সংস্থান নির্মাণ করে তোলার পদ্ধতি হিশেবে ডিকন্সট্রাকশনকে ভাবছেন স্পিভাক। সরাসরি কোনো সাবঅল্টার্ন বিষয়ী-সংস্থান থেকে, যেমন নারী বা প্রবাসী ইমিগ্রান্ট, কথা বলে উঠতে নিষেধ করছেন।

কিন্তু একটা অনন্ত-প্রসারিত সর্বব্যাপী সবার-মধ্যে-উপস্থিত সাধারণ বিষয়ী-সংস্থান হিশেবে সাবঅল্টার্ন নামক বর্গ চিহ্নিত করে বড্ড বেশি পরিমাণে বড্ড বেশি কিছুকে। এই সমস্যা এবং আরো কিছু

থেকে, একটা দূরত্ব তৈরি হয়, স্পিভাকের সঙ্গে আমাদের বক্তব্যের। এবার এই দূরত্বের স্থানাঙ্কগুলোকে নির্দিষ্ট করা যাক।

- সাবঅল্টার্ন বিষয়ী-সংস্থানকে খুঁজে দেওয়ার এবং নির্মাণের এমন সাধারণীকৃত একটা পরিকল্পনার জায়গায় আসা উচিত অনেক নির্দিষ্ট এবং চিহ্নীকরণযোগ্য কিছু। যেমন ধরুন, শ্রমিক-শ্রেনী বা ওয়ার্কিং ক্লাস — কিন্তু মাথায় রাখবেন — একটা বিশেষ্য নয়, বিশেষণ হিশেবে।[৬]
- আমাদের কাছে স্পিভাকের ওই নৈতিক অবস্থানের কোনো অর্থই নেই। যদি আলো-অন্ধকারে যেখানেই যাই না কেন আমাদের মাথার ভিতরে এটা কাজ করে যে, দেখো কাণ্ড, আমায় আত্তীকরণ করে নিল গো — তো ক্ষতি কী? যখন, আরো, চাই বা না-চাই, জানো ইয়া না-জানো/ মানো ইয়া না-মানো, আত্তীকৃত আমাদের হতেই হবে। তার চেয়ে তো মেনে নেওয়া ভালো, হম যো মিলে হ্যায় হামে/ অ্যায়সে হি মিলনা থা/ গুল যো খিলে হ্যায় উন্‌হে/ অ্যায়সে হি খিলনা থা, এর কিছু অন্যথা হওয়ার ছিল না। এটা জনমোঁ কা বন্ধন/ জনমোঁ কা রিশ্তে হ্যায়/ জব ভি হাম জনমে তো/ হাম এহি মিলতে হ্যায় — এই নিয়ে এতো ব্রেদলেস হওয়ার কী আছে স্পিভাকের? মুৎসুদ্দিপনায় এতো গভীর গভীরতর পাপের কী আছে যখন বেঁচে থাকার একটাই মডেল — মুৎসুদ্দি হয়ে বাঁচা? এসো তার চেয়ে আমরা সরাসরি প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের চোখে চোখ রাখি, সহজ চোখে তাকাই, আমাদের দাসত্বের আর একটু ভালো প্রভু হই।
- স্পিভাকের এই অপরাধবোধ ফলে ওঠে তাঁর নিজেরি তত্ত্বের আভ্যন্তরীণ বাইনারি অপোজিশন, দ্বিত্ব-ভেদ প্রকরণ থেকে। শোনাতে পারা এবং শোনাতে না-পারা স্পিভাকের কাছে সাদা আর কালো, স্পষ্ট এবং পৃথক। স্পিভাক ভুলে যাচ্ছেন ডট-ম্যাট্রিক্স প্রিন্টিং-এর পরেও আরো অনেক অনেক কিছু আছে, একটা আধুনিক গ্রাফিক্স দশ মিলিয়ন মানে এক কোটিরও উপর বর্ণভেদকে, শেডজ অফ গ্রে, ধূসরতার মাত্রাভেদকে চিহ্নিত করতে পারে।

আমি আমার কথাকে শুনিয়ে উঠতে পারবনা — ঠিক এটাকেই জেরা করে, ইন্টারোগেট করে আমাদের ডিকোলোনাইজেশন-এর ধারণা। জেরা করতে করতে এক জায়গায় নিয়ে আসে দুটি ভিন্ন মুহূর্তকে। দেরিদার ডিকন্সট্রাকশন আর লিওতারের দিফেরঁদ।

অর্থাৎ, আমাদের প্রশ্ন হল — আমাদের ওই স্যাভেজ, যার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি, সে কি কথা বলে উঠতে পারে পোস্টকোলোনিয়াল স্পেস, উত্তর-উপনিবেশ ভূমিতে? খেয়াল রাখবেন, এই সাবঅল্টার্ন বিষয়ী আর সেই আগেকার সহজ-সরল সত্তাটি নেই, সেই এসেনশিয়ালিস্ট সংস্করণ আর নয়। সে একটা নতুন সংজ্ঞা, নতুন অবয়ব ধারণ করেছে অতিনির্ণীত, পরস্পর পরস্পরের দ্বারা নির্মিত এবং নির্ণীত ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার আধারে। যেখানে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা দুজনেই দুজনকে নির্ণয় এবং নির্মাণ করছে। কেউই আর বিশুদ্ধ ঐতিহ্য বা বিশুদ্ধ আধুনিকতা নেই।[৭] এই নতুনতর সাবঅল্টার্ন বিষয়ী-সংস্থানটি আর বিশেষ্য নয়, বিশেষণ।

[৬] সাবঅল্টার্ন বিষয়ী-সংস্থানকে বিশেষ্য আর বিশেষণ, নাউন আর অ্যাডজেক্টিভ, এই দুটো ভিন্ন পদ্ধতিতে বিচার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে স্টিফেন রেজনিক এবং রিচার্ড উলফের 'নলেজ অ্যান্ড ক্লাস' নামক বইয়ে।

[৭] এনআরআই ভারতীয়দের পরবাসী দেশপ্রেম — দুর্গাপুজো, ডান্ডিয়া নৃত্য ইত্যাদি, যা তাকে নিজের আইডেনটিটি দেয় সাহেবদের দেশে, এই অতিনির্ণীত আধুনিকতা আর ঐতিহ্যের একটা চমৎকার উদাহরণ। এদের এই এনআরআই জাতীয়তাবোধ, জাতিসত্তা সত্যিই একটা সচেতন লোকেশন অফ কালচার, লোকেশন যা রিঅ্যা-লোকেশন। মিথিক মেমরি বানিয়ে তুলতে থাকা। বালি সাগুর রিমিক্সে, ডালের মেহন্দীর গলায় — ভারতের ন্যাশনাল আইডেন্টিটি। এই ভারতবর্ষ পয়দাই হয়েছে পরবাসে, যেখানে ডলারও আছে, মেহন্দীও, হাইব্রিড, পরস্পর অতিনির্ণীত। এনআরআইদের ভারতবর্ষ। যাদের ডান্ডিয়া খেলতেই হয়,

স্যাভেজ-এর বাচনক্ষমতার প্রশ্নটিকে আলোচনা করার জন্যই আমাদের দিফেরঁদ-কে প্রয়োজন।

দিফেরঁদ-এর একটা উদাহরণ মাস্টারপিস লেখার, অসাধারণ লেখা লেখার সমস্যা। ধরুন, একজন লেখক একটা মাস্টারপিস লিখেছে। কোনো সম্পাদক তা ছাপতে রাজী হচ্ছেনা। এবার, সেই লেখক কেমন করে প্রমান করবে যে এটা একটা মাস্টারপিস? প্রশ্নটাকে বাড়িয়ে তুলুন অনাগত কিন্তু আগমমান ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা অব্দি। ওই লেখক নিজেকে লেখক হিশেবে টিকিয়ে রাখবে কোন প্রকৌশলে? যে নিজে জানে যে সে মাস্টারপিস লিখছে আর এই জানাটাই তাকে একটা সলিটারি সেলে, একা অন্ধকার কালোকুঠরিতে বন্ধ করে দিচ্ছে — সসাগরা বসুন্ধরায় আর কেউ নেই যে একথা জানে। আর, কেউ জানতে পারবেও না, কারণ তার লেখা সে ছাপাতে পারছেনা।

দিফেরঁদ হল সেই সব সম্মুখীনতা যেখানে দুই বিপরীত বিন্দু, যারা পরস্পর মুখোমুখি, কখনো একত্র হতে পারেনা। যাদের কখনো মেলানো যায়না। মেলানো-টা সংজ্ঞাগত ভাবেই অসম্ভব। স্যাভেজ-এর সমস্যাও ঠিক এটাই। যা সে বলছে তা সে কখনোই শুনিয়ে উঠতে পারেনা। তাই, এখানে, স্যাভেজের রণনীতি হওয়া উচিত — তার রচনায়, তার টেক্সট-এর মাধ্যমে, কথা-বলা। নিজের বাচনে সে কথা বলবে না, কারণ কথা তো সে বলে উঠতেই পারেনা। তার হয়ে কথা বলবে তার টেক্সট। এই পদ্ধতি মানে :—

- স্যাভেজ তার মুখ বন্ধ করে, কথা বলা বন্ধ করে। এবং তার বাচন, তার বক্তব্য, তার কথা-বলা, চালিয়ে যেতে থাকে বিভিন্ন লেখার, টেক্সট-এর মাধ্যমে। টেক্সট-এর শরীরে তার প্রবেশে, পুনঃপ্রবেশে অনুপ্রবেশে।
- সবকিছু সত্ত্বেও, সবকিছুর পরও, বলা তাকে চালিয়ে যেতেই হবে। নিরবচ্ছিন্ন, ছেদহীন। হয়তো কখনো প্রেতের মত করে, চুপিসাড়ে, সাঁঝের ঝুঁঝকোবেলায়, সব বেড়ালেরাই যেখানে যখন ধূসর, নানাবিধ ধূসর অক্ষরে পাণ্ডুলিপিতে। যে বলা, যে লেখা, একদা কোনো ভবিষ্যতে, মেলাবেন তিনি মেলাবেন, ডিকন্সট্রাকশন আর দিফেরঁদ দুটোকেই, মেলাবেন তিনি মেলাবেন।[৮]

আমাদের সমস্যাটা ঠিক এই জায়গাটাতেই। এই ডিকন্সট্রাকশন আর দিফেরঁদ-কে সংযুক্ত করার। এই প্রেতচ্ছায়ে ঘোরাফেরার মানচিত্র নির্মাণের। এককথায়, এটা অসম্ভব। এই মেলানোটা। যদি ডিকন্সট্রাকশন বলতে আমরা একটা এলিটিস্ট কান্টিয়ান রকমকেই ভাবি। তা আমরা ভাবছিনা, আগেই বলেছি, আমাদের সেকশন দুই এবং তিনে। এই বার আমরা মেলাব আমাদের সেই অনির্ভেজাল দেরিদা আর দিফেরঁদ-কে। দেখব, কেমন প্রতিরোধের পাঁচিল সেটা গড়ে তুলতে পারে? পূর্ব/দক্ষিণের প্রতিরোধ, উত্তর/পশ্চিমের হাত থেকে।

মনে রাখবেন, আর্যরা ভারতে এসেছিল উত্তর/পশ্চিম থেকেই।

সেকশন তিন আমরা শেষ করেছিলাম টেক্সট এবং কন্টেক্সট-এর আভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রসঙ্গে। আমরা বলেছিলাম এবার আমাদের যাত্রাটা হবে কন্টেক্সট থেকে টেক্সট। আমরা আমাদের মত করে দেরিদার সাপ্লিমেন্ট-কে বুঝব, দিফেরঁদ আর ডিকন্সট্রাকশনকে মেলাতে গিয়ে।

দুর্গাপুজো করতেই হয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতেই হয়। নইলে তার নিজেকেই বলতে হবে, আমি তবে কেউ নই। এই আইডেন্টিটি, গোড়া থেকেই, আইডেন্টিটি অফ ইনকনফিডেন্স। নিজেকে ভারতীয় বলে বারবার চিহ্নিত করতে হয় তো তারি, যারা ব্যামবিনো থেকে ক্যাসেট নিয়ে গিয়ে দূর দ্বীপে বসে শোনে, এই পরবাসে রবে কে?

[৮] "দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে/ ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া হৃদয়ের আকাঙ্খার নদী/ ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় —/ ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি —/ তবে ওই পৃথিবীর দেয়ালের 'পরে/ লিখিতে যেয়োনা তুমি অস্পষ্ট অক্ষরে/ অন্তরের কথা! —/ আলো আর অন্ধকারে মুছে যায় সেসব ব্যর্থতা! ..."— লেখো ধূসরতায়, কবিতার বইয়ের নাম দাও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। হাজার হাজার পাতা গদ্য ঘোরগ্রস্তের মত লিখে যাও, প্রকাশ কোরোনা।

৬।। সাপ্লিমেন্ট

আমরা দেরিদার সাপ্লিমেন্ট-কে দেখছি হেগেলের দর্শনে একটা অনুপ্রবেশ হিশেবে। দিফেরঁস নামক ধারণার মাধ্যমে দেরিদা একটা ভাঙচুরকে চিহ্নিত করছেন। হেগেলের সমগ্র-র সামগ্রিক ঐক্যের, ইউনিটি-র শরীরে একটা ভাঙচুর। যা হেগেলের যুক্তিবোধের সঙ্গে একটা দ্বৈরথে প্রবৃত্ত হচ্ছে। দেরিদার, মানে আমাদের দেরিদার, আর একটা যুদ্ধ অন্যান্য উত্তরআধুনিকদের সঙ্গে, সেটা ইউনিটি নয়, ডিফারেন্স-এর এলাকায়। দেরিদাই প্রথম উত্তরআধুনিক যে বুঝতে চাইলেন অন্ধকারকে, ইউরোপের অপর-এর, আমাদের অন্ধকারকে। তাদের ট্রেসিং, তাদের অল্টারিটি, তাদের মেটাফরিক সারপ্লাস, তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে আলাদা করে নয়। সবকিছু সহ। দিফেরঁস কি ট্রেস কি স্পেসিং-অল্টারিটি কি সাপ্লিমেন্ট যাই ভাবুন না কেন, এগুলো বিয়িং-এর, সত্তা-র, নিজেকে ছাড়িয়ে, নিজের বর্গ-কে ছাড়িয়ে, ক্রমে, চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত প্রসারশীল হয়ে পড়ার পদ্ধতিটাকে বোঝার দিকে দেরিদার যাত্রার বিভিন্ন মুহূর্ত।

সত্তারনিজেকে ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ার এই পদ্ধতির সঙ্গে একটা প্রতিতুলনা আনা যেতে পারে পুঁজির আত্মমৈথুন-এর, যার মার্ক্সীয় নাম অ্যাকুমুলেশন। উভযোনি কেঁচো যেন, মৃত্তিকা খুঁড়ে খুঁড়ে গভীরে গোপনে ব্যাপ্ত থেকে ব্যাপ্ততর, পুঁজি শুধুই নিজের সঙ্গে মৈথুনে নিজেকে আরো বাড়িয়ে যেতে থাকে। শ্রম — শ্রমিক — শ্রমের সৌধ অর্থাৎ উৎপাদন তখন ঈশ্বরের কেঁচোর পুঁজির মল, ডিফিকেশন অফ ক্যাপিটাল। ছড়িয়ে থাকে মাটিতে। পুঁজি বাড়ে, বাড়তেই থাকে। নিজেকে ছাড়িয়ে। নিজেকে ভেঙে। কন্টিনিউয়াস রেভলিউশানাইজেশন অফ দি প্রোডাক্টিভ ফোর্সেজ। নিজের থেকে বড় হয়ে যেতে থাকে।

একই ভাবে, একটা টেক্সট-ও নিয়তই নিজেকে অতিক্রম করে যায়। নিজেকে ছাড়িয়ে উপচে পড়ে। বানিয়ে তুলতে থাকে সাপ্লিমেন্ট। সাপ্লিমেন্ট, সংযোজন দিয়ে নিজেই নিজেকে সংযোজিত করে। সংযোজন মানে যোগ নয় — যোগের পূর্বশর্ত স্বাতন্ত্র। যোগ ঘটে দুটি স্বতন্ত্র বস্তু বা সত্তার ভিতর। আর সংযোজন কখনোই সমগ্রের থেকে স্বতন্ত্র নয়, সংযোজন সংযোজিত হয় সম্পূর্ণ সমগ্রের শরীরে, সংযোজিত হয়ে প্রমাণ করে সম্পূর্ণের অসম্পূর্ণতা।।

পুঁজির অ্যাকুমুলেশন সংযোজন না হয়ে যোগ হতে পারত তখনই যদি পুঁজি বলে একটা স্বতন্ত্র স্বশাসিত স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা পাওয়া যেত, একটা ট্রান্সেন্ডেন্টাল সিগনিফায়েড। পুঁজির অস্তিত্ব থেকে ওই সংযোজনের পদ্ধতিকে যদি আলাদা করা যেত, যদি ওই পদ্ধতি পুঁজি নামক সত্তাটির নিজের অস্তিত্তেরই সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ না হত। পুঁজির নিজস্ব সংযোজনের পদ্ধতিকে ভিতরে নিয়েই পুঁজি বেঁচে থাকে, আলাদা করে আর কোনো অর্থই থাকেনা। পুঁজি একটা আলোচনার ক্ষেত্র, বিদ্যাগত ভূমি, ডিসকার্সিভ স্পেস, যার ভিতরেই আছে ওই সংযোজন। পুঁজি মানে পুঁজি বলতে যা বুঝি, আর সেই বোঝার ভিতরেই আছে সংযোজনের ওই পদ্ধতি। ওই সাপ্লিমেন্ট। যা আবার সাপ্লিমেন্ট করছে পণ্য নামক সত্তাকে। পণ্য নামক আলোচনার ক্ষেত্রকে। মানে সংযোজনকে সংযোজন করছে। বা সংযোজনকে সংযোজনকে সংযোজনকে...।

ট্রান্সেন্ডেন্টাল সিগনিফায়েড, চূড়ান্ত দ্যোতিত, একটা চূড়ান্ত সত্তা, এমন সত্তা যা সবাইকে অতিক্রম করে যায়, সব আলোচনাকে — এরকম কিছু হয়না, নেই। সব সত্তাই অসম্পূর্ণ, অন্য আর সব সত্তার মধ্যে ছড়িয়ে মিশে থাকে। প্রত্যেক সত্তার নিজস্ব বর্গের আলোচনার ক্ষেত্রই নিজেকে ছাড়িয়ে ছড়িয়ে থাকে সংযোজনে, পৌঁছে যায় অন্য বর্গে।

সংযোজন অন্দর নয়। অন্দর নয় বলেই অন্দর হয়ে উঠতে পারে। বাহির থেকে এসে অন্দরে সংযোজিত হতে পারে। সংযোজন বা সাপ্লিমেন্ট এমন একটা বাহির যা ইতিমধ্যেই সদাসর্বদাই, অলওয়েজ অলরেডি, টেক্সট-এর ভিতরে উপস্থিত। সাপ্লিমেন্ট-এর এই ব্যাখ্যাটা আমাদের কাজের পক্ষেও সুবিধার। অস্তিত্বতত্ত্বের বা অন্টলজির তলে বিচরণশীল সত্তা এবং তার বিদ্যাচর্চাগত প্রতিরূপ হিশেবে এপিস্টেম বা বিদ্যাস্থান — এই দুইয়ের ভিতরকার সম্পর্ককে বুঝতে এবং আকার দিতে সাহায্য করে আমাদের। এই সম্পর্কটা ঠিক হয় ইতিহাসতত্ত্ব এবং জ্ঞানতত্ত্বের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে, মায়া এবং বাস্তবের ক্রীড়া থেকে। বাস্তবটা মায়া নয়, বরং মায়াটা হল বাস্তব সম্পর্কে একটা বাস্তব মায়া। মায়া বাস্তবকে

সংযোজন, সাপ্লিমেন্ট করে। ধারাবাহিক এবং ক্রমাগত মায়ার স্রোতে গা-ভাসিয়ে বাস্তব বেড়ে যেতে থাকে, নিজেকে ছাপিয়ে ছাড়িয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে। দর্শন বেঁচে থাকে সাহিত্যের ভিতর, সাহিত্য হয়ে।[৯]

দেরিদার ভাষ্য মোতাবেক পূর্ণ উপস্থিতি কখনো ঘটেনা, তার ভিতর সবসময়েই একটা অভাব রয়ে যায়। আর পূর্ণ উপস্থিতির এই অভাবটার কারণেই তৈরি হচ্ছে সংযোজন।

সংযোজন মানেই আরো কিছু। আরো বেশি কিছুর যুক্ত হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণের সঙ্গে। এই যুক্ত হওয়াটা, দেরিদা যেমন বলেছেন, পূর্ণ উপস্থিতি-র একটা ঘাটতি বা খামতি থেকে সঞ্জাত। অথবা, সাসুর প্লেটো বা রুশোরা যেমন ভাবতেন, পূর্ণাঙ্গ সমগ্র-র শরীরে একটা যোগ, অ্যাডিশন। অন্য ভাবে বলতে গেলে, দেরিদা যেভাবে বুঝেছেন তাতে উপস্থিতি কখনোই আইডেন্টিটি হিশেবে সম্পূর্ণ বা সমগ্র হতে পারেনা। একটা ছেদহীন চেষ্টা চলতে থাকে সংযোজনের পর সংযোজনে ওই আইডেন্টিটিকে আরো সম্পূর্ণ করে তোলার — সম্পূর্ণ করে তোলার এবং সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার আগ্রহটা তার অসম্পূর্ণতাকেই আরো নিবিড়ভাবে প্রকাশ করে — সাহেব হতে তো সে-ই চায় যে সাহেব নয় — চেষ্টাটা নিজেই অসম্পূর্ণ — আইডেন্টিটিকে সে কোনোদিনই সম্পূর্ণ করে উঠতে পারেনা। এই চেষ্টা একটা আত্মবিনাশী চেষ্টা, কারণ 'আরো' শব্দটা একটা ওপন-এন্ডেড শব্দ — আরো মানে কতটা? — আরোর কোনো শেষ নেই। সংজ্ঞাগত ভাবেই চেষ্টাটা কখনো শেষ হতে পারেনা। সংযোজন থেকে আরো সংযোজন থেকে আরো সংযোজন ... ইত্যাদি।

পুরোনো মেটাফিজিকাল চিন্তাবিদদের কাছে উপস্থিতির ঘাটতি মানে অনুপস্থিতি, একটা ঋণাত্মক ধারণা। আর দেরিদার কাছে এই খামতি, ঘাটতি, ল্যাক-টা এলো একটা ধনাত্মক ধারণা হিশেবে। উপস্থিতি নামক ধারণাটাই গড়ে উঠছে তার অভ্যন্তরে ওই খামতিটাকে বহন করে। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে তার অসম্পূর্ণতাকে মিলিয়ে। অসম্পূর্ণতাটা এখানে সম্পূর্ণতাটারই অংশ।[১০]

উপস্থিতির খামতিকে ঋণাত্মক ভাবে নেওয়ার দোসর হিশেবেই আসে মেটাফিজিকাল চিন্তাবিদদের কাছে সংযোজনেরও একটা ঋণাত্মক দ্যুতি — একটা বিপজ্জনকতা যা অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত — দি ডেঞ্জারাস সাপ্লিমেন্ট — রুশো লিখেছিলেন। এঁরা সংযোজনকে থামিয়ে দিতে প্রতিহত করতে চেয়েছেন। এদের কাছে সাদা-কালো বর্গভেদটা ছিল এইরকম — সম্পূর্ণ ভালো, সংযোজন খারাপ।

দেরিদার মডেলে সমাজ নামক ভূমিটা বহন করে চলে অগন্য পার্থক্যের অনন্ত ক্রীড়াকে। পার্থক্য হল তাই যার আধারে বর্গেরা বেঁচে থাকে, কারণ কোনো চূড়ান্ত দ্যোতক, ট্রান্সেন্ডেন্টাল সিগনিফায়ার নেই। বর্গকে বোঝার একমাত্র উপায় অন্য বর্গের সঙ্গে তার পার্থক্যে, কারণ বর্গটির কোনো চূড়ান্ত অর্থ, কোনো চূড়ান্ত সংজ্ঞা নেই। এমন সংজ্ঞা যা সব আলোচনাকে অতিক্রম করে যাবে, সব জ্ঞানতত্ত্বকে। অস্তিত্বকে চিনি

[৯] বিদ্যার ক্রমবৃদ্ধি সংক্রান্ত কান্টের তত্ত্বের সঙ্গে একটা সহজ তুলনা আসতে পারে এখানে। অর্থাৎ সিংদরজার বদলে খিড়কি দুয়োর দিয়ে পশ্চিমের যুক্তিবিজ্ঞানকে ঢুকিয়ে আনা। পশ্চিমী যুক্তিশাস্ত্র কোনো টেক্সট-এর পাঠকের ভূমিকায় বসে একজন ধর্মপ্রচারকের দায়িত্ব পালন করে। 'ভো পাঁঠক, লক্ষ্য করো তোমার বিস্মৃতি, তোমার এবং তোমার টেক্সট-এর। এই বা এই এই এলাকা তোমরা বিস্মৃত হয়েছো।' যেন, ডিকন্সট্রাকশন একরকম নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্প — দুনিয়ার ডিসর্জনকারী এক হও, চলো, কিছু করি, কিছু ডিসর্জন করে দেখাই।

[১০] অবশ্যই এই সম্পূর্ণতাটা একটা জ্ঞানতাত্ত্বিক, এপিস্টেমলজিকাল সম্পূর্ণতা। অস্তিত্বতাত্ত্বিক, অন্টলজিকাল নয়। কোনো একটা বর্গকে বুঝতে গিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র, ডিসকার্সিভ স্পেস হিশেবে বর্গটির সম্পূর্ণতা — তার বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে এখানে কোনো প্রশ্নই উঠছে না। আর বাস্তবকে বাস্তব হিশেবে চেনাটাই তো একটা আলোচনার ফসল, চিন্তনের। কারণ অস্তিত্ব তো সবসময়ই বদলাচ্ছে, এমনকি আলোচনার সময়টুকুতেও, ওই আলোচনার মাধ্যমেই, বদলে যাচ্ছে বর্গটির বাস্তব দ্যোতিত, সিগনিফায়েড। এই সদাসর্বদা পিছলে যেতে থাকাটাকে মনে রাখবেন, এই অন্টলজিকাল স্লিপেজ-টাকে, এপিস্টেমলজি থেকে অন্টলজির, জ্ঞানতত্ত্বের থেকে অস্তিত্বতত্ত্বের এই পিছলে যাওয়া — এটাই দিফেরঁস।

আলোচনায়, চেনা মানেই আলোচনা, বর্গ হল বস্তুকে চিনে ওঠা, চেনার বাইরে কোনো বস্তু হয়না, আলোচনার বাইরে। দেয়ার ইজ নাথিং আউটসাইড দি টেক্সট।

কোনো সম্পূর্ণ উপস্থিতির ধ্রুবক-মান বসিয়ে তাই এই সমাজ-ভূমির সমীকরণ সমাধান করা সম্ভব না — এর কোনো সৃষ্টি নেই কোনো ভিত্তি নেই — শুধু সৌধ। কোনো একমুখী নির্ভরতা নেই। কোনো একেশ্বর ব্রহ্মের বেণী থেকে কোনো গঙ্গা প্রবাহিত হয়না। এসেনশিয়ালিস্ট একমুখী কার্যকারণসম্পর্কের বোধ এই মডেলে ভেঙে ফেলা হয়। বারবার।

সমস্ত উত্তরআধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর যেটা একদেশতা, যেটায় তারা সবাই বিশ্বাস করে, সেটা হল একটা রিফু করা সমগ্র-র ধারণা। একটা ছেঁড়া ছেঁড়া সচ্ছিদ্র সমগ্র। একটা সমগ্র যা ছিঁড়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ভর্তি শুধু খানা খন্দ গহ্বর আর তাদের ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা, রিফু করে সেলাই করে তোলা সমগ্র। ঘনপীনদ্ধ দৃঢ়বদ্ধ কায়া হিশেবে কোনো সমগ্রকে আর ভাবা অসম্ভব। সমগ্র হিশেবে সমাজভূমি-র এই গঠনগত অসম্ভাব্যতাটাই শাসনের একটা একচ্ছত্রতা-কে, একটা হেজেমনি-কে জরুরি করে তোলে। যে হেজেমনি আকাশের মত ব্যাপ্ততায় করাল মেঘের ছায়া ফেলবে সমাজভূমির প্রতিটি বিন্দুতে। সেতুবন্ধ করবে সব ফাঁকফোঁকর সব খানাখন্দর উপর দিয়ে। পুনর্নির্মাণ করবে সেই সমস্ত সেতু যা তুমি পুড়িয়েছো, ভেঙেছো, ফ্যাসিস্ট হেজেমনিকে রোখার চেষ্টায়, যেমন পোড়াত রেডফোর্স, নাজিরা যখন ঢুকে আসছে রাশিয়ার আরো আরো গভীরে — মানে, ইয়ে, পোড়াবে বলে ভেবেছিলে, পারোনি, কারণ আসলে কোনো সেতু ওখানে ছিলইনা।

কানের কাছে বসে যারা নামতা শোনাত সেই সাতশো উড়েদের সুরের পারস্পরিক পার্থক্য যতই থাকুক, তারা কেউই যেমন শিবঠাকুরের আইনকে চ্যালেঞ্জ করেনি কখনো, তেমনি সব বৈচিত্রের মধ্যেও একটা সর্বব্যাপী মিল আপামর উত্তরআধুনিকদের। তারা এই ফাঁকফোঁকরগুলোকে সোশাল-এর, সমাজভূমির দুর্বলতা, মজবুরির জায়গা বলে ভেবেছেন।[১১] এই ফাঁকফোঁকর গুলো আসলে একই সমাজ-মুহূর্ত সসীমতায়

---

[১১] এই জায়গায় দাঁড়িয়েই রণজিত গুহর সরাসরি নাকচ করে দেওয়া ঔপনিবেশিক ভারতে কোনো ব্রিটিশ হেজেমনির সম্ভাবনাকে। গুহ আমাদের দেখিয়েছেন, কীভাবে এবং কতবার ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ শাসন ভারতের চিরাচরিত মূল্যবোধ, ট্র্যাডিশনাল ভ্যালুজ-এর সঙ্গে সমঝোতা করেছে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি ভারতীয় প্রজাদের কনসেন্ট-কে, সামগ্রিক সামাজিক সম্মতিকে আদায় করতে গিয়ে। এই আলোচনা করতে গিয়ে গুহ এনেছেন ধর্ম-অধর্মর প্রসঙ্গ। যার সাপেক্ষে ভারতীয় উপনিবেশের মানুষ ঔপনিবেশিক প্রভুর শাসনের প্রতি তার নিজের বশ্যতাকে বুঝত। ধর্ম — যা বলে যে কোনো রাজা বাধ্য তার প্রজাদের ন্যূনতম জৈবনিক প্রয়োজন এবং সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া রোধ করতে। তার রোটি কাপড়া মকান আর তার নিজের ধর্মবিশ্বাস। একজন রাজা ধার্মিক থাকতে তার প্রজার এই প্রয়োজন এবং দেশের সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক প্রকল্প, যেমন জলসেচ, বাঁধ, চিকিৎসা, পথনির্মাণ — এগুলোকে মিটিয়েই। প্রজার প্রতিরোধ একটা ধার্মিক ক্রিয়া যদি এই চাহিদাগুলো রাজা না মেটায়। ধর্ম দাবি করে যে দেশের দুর্ভিক্ষের প্রহরে রাজা বিলাসী হতে পারেনা। এবং, যদি রাজকোষে উদ্বৃত্ত খাদ্যশষ্য থাকে রাজা তা বন্টন করবে অভুক্ত প্রজাদের। নয়তো — ধর্মঘট — অধার্মিক রাজার বিরুদ্ধে প্রজার প্রতিরোধ। গুহ দাবি করেছেন যে ভারতের মানুষের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে এই ধর্মবোধ, ট্র্যাডিশন, অঙ্গাঙ্গী মিশে থেকেছে আধুনিকতার, মডার্নিজমের, পুঁজির মতাদর্শের সঙ্গে। যাকে গুহ ব্যাখ্যা করছেন হেজেমনির আধুরাপন, অসম্পূর্ণতা, খামতি হিশেবে, ট্র্যাডিশনের সঙ্গে একটা বাধ্যতামূলক সমঝোতা হিশেবে। আমরা একমত গুহর এই ধারণার সঙ্গে যে ভারতীয় সাপ খেলানোর ব্রিটিশ গান নিছক এইচএমভির ক্যাসেট বা সিডি, হিজ মাস্টার্স ভয়েস ছিলনা। ভারতে ব্রিটিশ বশীকরণের প্রতিটি পদ্ধতিতে মিশে থেকেছে আধুনিকতা আর ঐতিহ্য, পুঁজির মূল্যবোধ আর প্রাকপুঁজি মূল্যবোধ। কিন্তু গুহ যাকে হেজেমনির অভাব বলে ভেবেছেন আমরা সেখানে দেখছি একটা নতুন আবাহন, একটা বিসমিল্লা, একটা নয়া শুরুয়াত। একটা অন্য ধরনের শাসনের ভূমি, কৃত্রিম ভূমি, সিন্থেটিক স্পেস। যার কথা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু বিশদে এই আলোচনার জায়গা অন্যত্র।

আর অসীমতায় ভাগবাটোয়ারা হয়ে পড়ায় গজিয়ে ওঠা সব ভাঙচুর। যা সমাজভূমির সংজ্ঞাগত ভাবে আভ্যন্তরীণ।

দেরিদার মডেলে এই খন্দবহুল সমগ্রকে হাজির করা হয় নিয়ত-বর্দ্ধমান-ব্রহ্মাণ্ড, এভার এক্সপান্ডিং ইউনিভার্সের আকারে। সমগ্র যা তার নিজের চেয়ে বড়। এবং যা যতিহীন, শেষহীন রকমে বেড়ে চলেছে তার নিজের চতুর্দিকে — বেড়ে চলেছে, কিন্তু, ক্রমবর্দ্ধমান ব্যাসার্দ্ধের সুষম বৃত্তে নয়। কারণ তার সবগুলো বৃত্তই হত সমকেন্দ্র — কেন্দ্র তাদের রয়ে যেত একই, কেন্দ্র এক আর তার চারপাশে বাড়তে থাকা পরিধির মার্জিন — বাড়ছে, বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে পেরিয়ে যাওয়া যাচ্ছেনা। এক্ষেত্রে বেড়ে যাওয়াটা ঘটে ওই সমগ্রের স্পেসিং-এ, অল্টারিটি-তে, যে ভূমি তার গঠনেই বিষম অসমান অপ্রতিসম।

এই ধরনের ক্রমবর্দ্ধমানতার একটা দেরিদীয় উদাহরণ ইউরোপ। 'ইউরোপ দি আদার হেডিং'-এ দেরিদা খেলা করছেন এমন একটা পরিস্থিতি নিয়ে যেখানে একটা বর্গ তার নিজেরি গর্ভে তার নিজের অসম্ভাব্যতাকে বহন করে।

ইউরোপ, সেই বৃদ্ধিশীল সত্তা, তার নিজের চেয়ে বড়। তার প্রসারমানতা, তার *গ্রোথ অফ দি সয়েল* পৌঁছে যাচ্ছে ইউরোপের বাইরে, আর সব অনিউরোপিয় সয়েলে। এশিয়ায়, আফ্রিকায়, সব জায়গায়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে। এটা ইউরোপের একটা জোরের জায়গা, শুধু ইউরোপ কেন, যে কোনো ইউরোপেরই, যে সে ইউরোপ এবং অনিউরোপ দুটোকেই ধারণ করে। ধারণ করে ইউরোপের অন্দর আর বাহির, নিজ আর অপর দুটোকেই। ইউরোপকে অতিক্রম 'করে ইউরোপের এই ক্রমবর্দ্ধমানতায় সংযোজিত হয়ে চলে যে সংযোজনেরা তাদের ফ্লাক্স তাদের বলরেখা আঁকা থাকে ইউরোপের বাহিরের বাইরে, তার অপরেরও অপরে।

হেগেলের কাছে সান্ত এবং সসীম তার নিজের চেয়ে বড়, এবং, তাই, অসীম। ঠিক এইখানটায় হেগেলে অনুপ্রবেশ করছেন দেরিদা, এবং ঘোষণা করছেন যে সসীম তার নিজের চেয়ে বড় কিন্তু অসীম নয়। ক্রমবর্দ্ধমানতার যে যাত্রা যত যাত্রাতেই সত্তা নিয়োজিত হোক না কেন তারা ভীষণভাবেই সসীমতার সীমায় সীমিত। আর এইটাই ডি- এবং কন- সবরকম স্ট্রাকশনের মূলাধার, এখান থেকেই জাগ্রত হয় কুলকুণ্ডলিনী, জাগিয়ে তোলে নতুন নতুনতর পাঠের পাঠান্তরের ডাকিনীযোগিনীদের।

৭।। ডিকন্স্ট্রাকশন ডিকলোনাইজেশন

ডিকন্স্ট্রাকশন একটা বিপরীতকরণী মুদ্রা — এর ভিতর উপ্ত থাকে একটা বিপরীতকরণ, ইনভার্শান। ডেরিভেটিভ কনসেপ্ট, উপজাত ধারণাদের পাল্টে ফেলা হয় প্রাইমারি কনসেপ্ট-এ, প্রাথমিক শাসক ধারণায়। তাই, এলিট এবং সাবঅল্টার্ন শব্দ/ধারণাদের ভিতরকার গুরুত্বের ক্রমভেদটা, হায়েরার্কিটা যায় উল্টে।

আমরা দিফেরঁদ এবং ডিকন্স্ট্রাকশনকে মেলাতে চাই। মেলানোর জন্য আমরা যা করছি তা একদম আগমার্কা পল্লবগ্রাহিতা। লিওতার বেশ অনেক লিখেছেন। সেই ঢের সারা প্রচুর পাতার থেকে ঠিক একটা পল্লব মানে পাতা আমরা কেটে নিচ্ছি মানে গ্রহণ করছি, একটা বা হয়তো দেড়টা, ম্যাক্সিমাম দুটো, ঠিক যে পাতাটায় দিফেরঁদ লেখা মানে ছাপা আছে। আর এর সঙ্গে ডিকন্স্ট্রাকশনকে সেঁটে দেওয়ার জন্যে আমরা পাকিয়ে তুলছি আমাদের একটা নিজস্ব ভালগারাইজড দেরিদা ভার্শান — অনির্ভেজাল দেরিদা সংস্করণ। যা ওই কাট অ্যান্ড পেস্ট-এর স্বার্থে একদম স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেরিদা এবং তার ডিকন্স্ট্রাকশনকে এই উর্দ্ধপদ হেঁটমুণ্ড করে তোলাটা আমাদের কাজের স্বার্থে। ১০০% খাঁটি দেরিদাকে নিয়ে এই কাটো-আর-সাঁটো আমরা করতে পারতাম না। দিফেরঁদদের সঙ্গে কথোপকথনে আসতে পারতাম না।

তাই আমরা ডেলিবারেটলি ভেজাল মেশাচ্ছি দেরিদায় আর তার ডিকন্স্ট্রাকশনে। যার স্টেপগুলো এইরকম :—

- ‘প্রি’ এবং ‘পোস্ট’ — এই দুই-এর ভিতরকার যে গুরুত্বের ক্রমভেদ, হায়েরার্কি — দেরিদার টেক্সটপাঠের তত্ত্বে সব হায়েরার্কি ভাঙার পরেও যে হায়েরার্কি অবশিষ্ট রয়ে যায়, সেইটাকে ওল্টানো।
- আর তারপর, টেক্সট-এর ভিতর যা ইতিমধ্যেই সদাসর্বদাই আছে, তাকে সাপ্লিমেন্ট করা, তার সঙ্গে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সচেতন সংযোজনে যাওয়া।

দেরিদার গতিপথ টেক্সট থেকে সাপ্লিমেন্টে। ঠিক টেক্সট-কন্টেক্সট প্রসঙ্গে আমরা যেমন আলোচনা করেছিলাম, এক্ষেত্রে সেটা সত্যি টেক্সট এবং সাপ্লিমেন্ট-এর ভিতর। টেক্সট এখানে ‘প্রাক’ বা ‘প্রি’ এবং সাপ্লিমেন্ট ‘উত্তর’ বা ‘পোস্ট’। এবং নির্ভেজাল খাঁটি দেরিদায় এই লজিকপথ কখনো জেরার মুখে পড়েনি। কখনো উজানে বৈঠা দেওয়া হয়নি। টেক্সট প্রাক। এবং সাপ্লিমেন্ট, টেক্সট-এর অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ করার ক্ষমতায় দাঁড়িয়ে, উত্তর। অসম্পূর্ণ টেক্সট নামক চিরশেষহীন প্রশ্নের উত্তর সাপ্লিমেন্ট। যা টেক্সট থেকে বয়ে আসে। টেক্সট-এর সেই বাহির যা ইতিমধ্যেই সদাসর্বদাই টেক্সট-এর অন্দরে ছিল। টেক্সট থেকে সাপ্লিমেন্ট-এ এই প্রবাহ, এই ‘প্রি-পোস্ট-এরাস’ হায়েরার্কি — একে কখনো চ্যালেঞ্জ জানানো হয়নি খাঁটি দেরিদায়। একটা হায়েরার্কি যা অপ্রশ্নেয়। টেক্সট-এর হায়েরার্কি ওল্টানোর দেরিদাবতার কখনো সম্মুখসমরে যাননি এই হায়েরার্কির, এই মাদার অফ অল হায়েরার্কিজ-এর, তাই আসলে নিজের দিকেই তরোয়াল উঁচিয়েছেন, নিজের সঙ্গেই ভেদাভেদে — শোনো বাপু, বড় হও, বোঝো, সব ক্রমভেদ অভেদিত হতে পারেনা, নট অল হায়েরার্কিজ ক্যান বি ডিহায়েরার্কাইজড। কলকাতা বইমেলা বোঝেনি, গাল যতই চমকাক, গুরুর বয়স তো হচ্ছে।

আসুন, সংযোজন-কে, সাপ্লিমেন্ট-কে একটা ছিন্ন অংশ বলে ভাবা যাক। পিতৃটেক্সট-এর শরীর থেকে লম্বমান, ঝুলে থাকা ছিন্নপত্র নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে যাদের কোনো পিতা নেই। বেজন্মা — যারা বাবা খুঁজছে। কিন্তু সাপ্লিমেন্ট-রা তো সাপ্লিমেন্ট করে মূল-কে, তাদের পিতাকেই। তাই পিতারিক্ত সাপ্লিমেন্ট তো সাপ্লিমেন্ট হতে পারেনা। এই অসংযোজনোচিত সংযোজন — সংযোজন যাদের কোনো পিতা নেই — এটাই দিফেরঁদ সম্পর্কে আমাদের ধারণা। বেজন্মা — যারা তাদের বাবা-পাওয়ার প্রতীক্ষায়। উপনিবেশের প্রজা — যারা খুঁজছে একটা ঔপনিবেশিক প্রভু, কারণ তাদের কোনো প্রভু নেই। একপিস ক্যাপিটালিস্টের অপেক্ষায়, রঁদার ভাবুকের ভঙ্গীতে ঝিম মেরে থাকা মজুরি শ্রমিকেরা।

তাই এখন আমাদের কাজ এইসব বাবাশিকারী বেজন্মাদের ‘এসো বাবা বোসো বাবা’ করা, শান্ত করা। তাদের জন্যে একটা ভালো দেখে টেক্সট খুঁজে তাদের থিতু করে দেওয়া, স্থান চিহ্নিত করে দেওয়া। আর, মনে রাখবেন, একই সঙ্গে, লিপিবদ্ধ করে চলা এই দিফেরঁদদের।[১২] আমাদের কার্যক্রম —

(১) লিপিবদ্ধ করা এই দিফেরঁদদের, রেকর্ড করে চলা, আর একটা স্তরের আলোচনা, ডিসকোর্স হিশেবে। চালু গৃহীত শাসক ডিসকোর্সের তলায় তলায়, গভীরে, গোপনে, একটা নিচের স্তরের ডিসকোর্স। লিপিবদ্ধ করে চলো সেইসব উপাদান যা চালু ডিসকোর্স অনুমতি দেয়না লিখে ফেলার, লিপিবদ্ধ করার, রেকর্ড করার। এই দিফেরঁদরা একটা বিশেষ জাতের দিফেরঁদ, যারা, পরে, ভবিষ্যতে,

---

[১২] যদি এমনকি এও হয় যে এই লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাওয়াটা গজিয়ে উঠছে আর একরকম ‘স্লাই-সিভিলিটি’ থেকে, ভাভা যাকে তার ‘লোকেশন অফ কালচার’-এ উপনিবেশের চিহ্ন বলে দেখিয়েছেন। ঔপনিবেশিক প্রভুর হাতে সঠিক এবং সামগ্রিক সাম্য আর ন্যায় যদি নাও পুরোপুরি ঘটে তো ক্ষতি নেই, লিখে তো রাখা হচ্ছে, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে, অক্ষরে অক্ষরে, এত এত রাইটার, এক জাতি রাইটার, সুবে বাংলার যেকোনো বাড়িই রাইটার্স বিল্ডিং, মেকলের রাইটাররা লিখে যাচ্ছে, খতিয়ানের পর খতিয়ানে, ফাইলের পর ফাইলে। একদিন এসব রাইটিং পড়া হয়, তখন এমনকি কোনো লর্ড ক্লাইভকেও শাস্তি পেতে হয় — ন্যায়ের জায়গায় তার সারোগেট, রাইটিং-এর প্রতিষ্ঠা। এটাই হোমি ভাভার স্লাই সিভিলিটি। ভাভা তার স্লাই সিভিলিটিকে খুঁজে পেয়েছিলেন ঔপনিবেশিক ভূমিতে, অন্য আরো অনেক কিছুর মত। কিন্তু উত্তরউপনিবেশ?

কোনো এক অনিশ্চিত সময়ে গিয়ে, তাদেরই মত আরো বহু টেক্সটবিহীন দিফেরঁদের সঙ্গে মিলে জমাট দ্রবীভূত এক হয়ে যাবে, মিশে যাবে চালু শাসক ডিসকোর্সে। তারও পরে, আরো দূরের ভবিষ্যতে, কোনো একদিন সেই নয়া পরিবর্তিত ডিসকোর্সের লিপিবদ্ধ হওয়ার স্মৃতিচারণে লেখা হবে "... অনেক অনেক ফাঁক রয়ে যেত। পরে, ক্রমে, ধীরে, তাদের ভরাট করা হত, খেপে খেপে, একটু একটু করে ... লোকে তো বলে যে কতকগুলো নাকি কোনওদিনই ভরাট হয়নি। হয়ত, এটাও আর একটা রূপকথা ... যাদের কেউই কোনওদিন যাচাই করতে পারবেনা ... তার নিজের জীবনে, একার চোখে, একার বিচারে ... পুরো নির্মাণটার যা ব্যাপ্তি ... ওই কঠোর পরিশ্রম, যা তাদের দীর্ঘতম জীবৎকালেও শেষ হবেনা, তাদের হতাশার শূন্যতায় ঠেলে দিতে পারত ... সেই কারণেই চালু হল এই খণ্ড খণ্ড করে নির্মাণের প্রথা।" আমাদের ডিকলোনাইজেশনও, কাফকার পাঁচিলেরই মত, একটা খণ্ডনির্মাণের পদ্ধতি।

(২) প্রতীক্ষায় থাকা, যেমন শ্বাপদ থাকে, নিঃশব্দ, মনোযোগী, ধূর্ত এবং নির্মম, সেই টেক্সট এর জন্যে, যার সংযোজন হয়ে উঠতে পারে এই পিতারিক্ত দিফেরঁদরা।

এই পুরো কার্যক্রমটা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে তখনই যদি এবার এই দিফেরঁদদের আমরা কন্টেক্সট করে তুলি — টেক্সট পাঠের নতুন কন্টেক্সট। যদি চালু টেক্সটগুলোকে এবার এই দিফেরঁদদের সাপেক্ষে, এদের রেফারেন্সে, এই কন্টেক্সট থেকে পাঠ করা শুরু হয়। তাই আমাদের কার্যক্রমে তৃতীয় ধাপ:—

(৩) একটা চালু পরিচিত গৃহীত টেক্সটকে এবার দিফেরঁদদের দৃষ্টিকোণ থেকে পড়া। দিফেরঁদকে কন্টেক্সট হিশেবে নাও এবং তার পাঠের কাঁচামাল হিশেবে যোগান দাও একটা মানানসই কিন্তু আপাত-অনুপস্থিত টেক্সট।

লক্ষ্য করুন, আর কিন্তু টেক্সট কন্টেক্সট-কে উৎপাদন করছে না। কন্টেক্সট হয়ে দাঁড়িয়েছে বহিরাগত প্রদত্ত এক্সোজেনাস। পিতারিক্ত জারজ শব্দদের ডিকন্স্ট্রাকশনের পদ্ধতির ভিতর মিলিয়ে নিয়ে আমরা প্রশস্ত রাজপথ উণ্মুক্ত করে দিয়েছি দিফেরঁদদের জন্যে। এটাই ডিকলোনাইজেশন। ডিকলোনাইজেশনের ক্রিয়াপদ্ধতির একটা মূল জায়গা ডিকন্স্ট্রাকশন। সাবঅল্টার্ন ধারণাদের দ্বারা এলিট ধারণাদের ডিকন্স্ট্রাকশন — যা ঘটানো হচ্ছে বিস্মৃত শব্দ-দের সাহায্যে, টেক্সট-এর ভিতরে এবং বাইরে। গীতায় অর্জুন যা করতে নিবিড় ভাবে নিষেধ করেছিলেন আমরা এখানে সেটাই করছি। দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ/ উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ। কৌলীন্য অর্থাৎ কুলধর্মের বিনাশে আমরা নিযুক্ত, প্রবন্ধের সেই গোড়া থেকেই। এবং, ডিকলোনাইজেশনের এই প্রক্রিয়াটা আসলে বর্ণসঙ্কর উৎপাদনের পুরো অ্যাসেম্বলি লাইন। একটা সচেতন ভালগারাইজেশন, অশ্লীলায়ন, অশালীনীকরণ — একটা শব্দের সার্কাস, শব্দ নিয়ে খেলা, জাগলারি, শব্দ আর ধারণা — স্ত্রীষু দুষ্টাসু জায়তে বর্ণসঙ্করঃ — শব্দের ব্যাভিচার — কুলীন শব্দ/ধারণাদের সঙ্গে শুইয়ে দেওয়া যত বেজন্মা বিস্মৃত পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট শব্দদের।[১৩]

[১৩] কখনো এই পদ্ধতি ঘোষিত এবং উচ্চারিত। আর কখনো গোপন। কখনো লেখা হল, অথচ প্রকাশ্যে আনা হল না, আনা হল না দিনের আলোর স্পষ্টতার এনলাইটেনমেন্টে। কখনো একই লেখার শরীরে খেলা করল যুক্তি আর যুক্তিহীনতা, অর্থ আর অর্থহীনতা — লেখাটা নড়াচড়া করে চলল বোঝা এবং না-বোঝার মার্জিনে। সেই নড়াচড়ার আলো-আঁধারি থেকে ছড়িয়ে পড়ছে উদ্বৃত্ত অর্থ। কখনো এই আশায় যে পঞ্চাশ বছর একশো বছর দূরে, পাঁচশো কিলোমিটার হাজার কিলোমিটার দূরে, দূরের কোনো বন্ধুর কাছে, কোনো অধিকারীর মন্ত্রোচ্চারণের অন্ধকারে নানা নতুন নতুন অর্থের ডাকিনী জেগে উঠবে এই একই লেখার থেকে। আর কখনো আশায় নয়, ভয়ে। স্বেচ্ছাকৃত নৈঃশব্দ্য, নিরাপত্তাবোধ। লুকোচুরি খেলে চলা। নিজের মৃত্যু নিকটবর্তী বুঝে ভিতরে কিলার ইনস্টিংক্ট জেগে ওঠা, স্থবির শিথিল নাক বেয়ে নিয়তই চশমা খসে আসতে থাকা, বুড়ো অ্যাকাডেমিশিয়ান, বুড়ো লেখকদের চোখ থেকে বাঁচিয়ে চলা লেখাটাকে, যাতে ওই দূরের বন্ধুদের কাছে লেখাটা বেঁচেবর্তে পৌঁছতে পারে।

ডিকলোনাইজেশন এই ধারণাটা একটা ছাতার মত, একটা আমব্রেলা কন্সেপ্ট, যাকে তত্ত্বের টেবিলে ফেলে এর চেয়ে বেশি আর বোঝানো যায়না। শুধু উদাহরণ দেওয়া যায়। কারণ, ডিকলোনাইজেশন ওই অর্থে কোনো তত্ত্ব নয়, তত্ত্বের সাবভার্শন, তত্ত্বের নাশ, ধর্ষণ, ব্যাভিচার। ডিকলোনাইজেশনের পুরো কার্যক্রমটা হল সঠিক নিখাদ নির্ভেজাল দেরিদার একটা বিকৃতি, বিচ্যুতি, কুলনাশ। হায়, বেচারা কৌলীন্যবাদী কান্টিয়ানরা! আমরা এখানে টেক্সট-এর লজিকের শাসন থেকে বেরিয়ে আসছি, তার 'প্রি-' এবং 'পোস্ট-', 'প্রাক-' এবং 'উত্তর-' — এই কালক্রম, ক্রোনোলজি থেকে। প্রথমে আমরা নির্বাচন করছি কন্টেক্সট, তারপর নির্মাণ করতে করতে প্রবেশ করছি কন্টেক্সটপ্রসূত টেক্সট-এ। এই পদ্ধতির পদক্ষেপগুলো একবার লিখে ফেলা যাক।

- শুরু করা কন্টেক্সট থেকে — 'প্রাক-'।
- খুঁজে বার করা তার একটা মানানসই টেক্সট — 'উত্তর-'।
- টেক্সট এর কিছু ধারণাকে প্রাথমিক এবং তাই অন্যদের প্রসূত বলে ধরে নেওয়া, কন্টেক্সট মোতাবেক।
- পিতারিক্ত বেজন্মা শব্দ/ধারণা/অর্থ-দের টেক্সট-এর ভিতর ঢুকিয়ে আনা এবং সেখানে তাদের জায়গা বানিয়ে দেওয়া — তাদের অভিঘাতে টেক্সট-এর নতুন অর্থের প্রস্তুতি।
- টেক্সট-এর চালু শাসক গৃহীত একচ্ছত্র অর্থদের সঙ্গে এই নতুন বেজন্মা অর্থদের প্রতিতুলনা।

অর্থাৎ, আমরা এখানে টেক্সট-এর উপর তার অর্থের মতাদর্শগত প্রভুত্বকে প্রশ্ন করছি। টেক্সট এবং তার যে অর্থকে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাই, সেই অর্থ ভেঙে পড়ছে। টেক্সট এবং অর্থের চিরাচরিত পারস্পরিক সম্পর্ক ইকনমিক কালচারাল এবং পলিটিকালের স্তরে ভেঙে পড়ছে, আর স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যাচ্ছেনা সেই সম্পর্ককে, ক্রমপরিবর্তমান পরিস্থিতিতে।

দেরিদাকে আমাদের ধর্ষণটা ঠিক এইখানে — লেবু কচলাতে কচলাতে তেতো করে দেওয়ার মত আমরা কন্টেক্সট-এর উপর গুরুত্ব বাড়িয়েই চলেছি। অসঙ্গতভাবে। নির্ভেজাল দেরিদাবাদীরা এটা মেনে নেবেন না। আলোচনার প্রসঙ্গ হিশেবে না ভেবে আমরা ক্রমে প্রসঙ্গের আলোচনা করে তুলছি — আমার গোঁফের বদলে গোঁফের আমি।

যুক্তিগঠনের, লজিকের লেভেলে কন্টেক্সট-কে আমরা একটা স্বশাসন দিচ্ছি। এখানে, এই প্রবন্ধে, আমরা লজিকের আশ্রয় নিচ্ছি কারণ প্রবন্ধ মানে অ্যাকাডেমিকতা, আমরা কথা বলছি অ্যাকাডেমির সঙ্গে, শাসক ক্ষমতার সঙ্গে। সব খেলার মত অ্যাকাডেমিখেলারও একটা নিয়ম আছে, যে নিয়ম মেনেই সেটা খেলতে হয়।

কিন্তু, যখন এই অ্যাকাডেমিখেলার বাইরে, যখন শুধু আমাদের দিফেরঁদদের সঙ্গে? যে দিফেরঁদরা এই বেদনার থেকে উদ্ভূত যে আমার কথা আমি বুঝিয়ে উঠতে পারছিনা। আর বোঝাতে পারছিনা বলেই আরো কিছুতেই বোঝাতে পারছিনা, সেটা যে বোঝার মত, বোঝার পরিশ্রমের যোগ্য সেই কথাটাই আর বোঝাতে পারছিনা।

সেই দিফেরঁদদের সঙ্গে একা যখন, একা, কিবোর্ডের উপর আঙুল নড়ছে, ডি-ড্রাইভে ভরা টি-সিরিজের সস্তা সিডি ছাপা পাঁচাশি কিন্তু শিয়ালদা ফ্লাইওভারের নিচে মাত্র ষাট টাকা নেয়, অভিজিতের গলায় কিশোর, রুক যানা নেহি তু কঁহি হারকে, কাঁটোপে চলকে মিলেঙ্গে সায়ে বাহারকে, ও রাহি, ও রাহি, কিবোর্ডে আঙুলের শব্দ, ক্রিচ ক্রিচ ক্রিচ, কোই নাহি তো তেরে আপনে, আর কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই, সাথি না কারবাঁ হ্যায়, ইয়ে তেরা ইমতেহাঁ হ্যায়, দেখ কহি কোই রোক না লে তুঝকো পুকারকে, ও রাহি, ও রাহি, এসো আবাহন করি আমাদের যুক্তিহীনতাকে, পাগলামি বিকৃতি অপরাধপ্রবণতাকে, রাইটিং অ্যাজ ডেভিয়ান্স, রাইটিং অ্যাজ সাবভার্শন, বন্ধ উচ্ছাসকে উণ্মুক্ত করো, হিস্টেরিয়া, অবরুদ্ধ পরিত্যক্ত বর্জিত বাতিল অপরাধীদের ডেকে আনো, নৃমুণ্ডের আবছায়ায়, লিখে চলো, কিবোর্ডে আঙুল নড়ে, রুক যানা নেহি, ও রাহি, ও রাহি।

যেমন আগেই বলেছি, আর তাত্ত্বীকরণ নয়। তত্ত্বে আর কিছু বলা যায়না। কিছুই কি বলা যায়, তত্ত্বে, যা 'কশ্চিদর্থমিতি বা' নয়। আর সব, যারা বা যা এখনো শব নয়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে উপচিয়ে থাকে ইকনমিকে, পলিটিকালে, কালচারালে।

মাইরি, আর জাস্ট একটা সেকশন, বললাম যে তত্ত্ব নয়, উদাহরণ, বোরহেস থেকে দেওয়া যাক সেই উদাহরণ। বোরহেসের একটা গল্প ব্যবহার করে বিশদ করা যাক ডিকলোনাইজেশনের পদ্ধতিটা কার্যক্রমটা ঠিক কী।

৮।। বোরহেস

'থীম অফ দি ট্রেইটর অ্যান্ড দি হিরো', বোরহেসের একটা ছোট গল্প, খুবই ছোট, মাত্র দু-পাতার, 'ল্যাবিরিন্থ' নামে সঙ্কলনের অন্তর্গত।[১৪]

গল্পে বিবৃত হয়েছে রায়ানের তদন্ত, টেক্সট আলোচনা ইতিহাস ফুঁড়ে ফুঁড়ে অনুসন্ধান, ডিসকার্সিভ ইনভেস্টিগেশন। যে রায়ান "... তাঁর প্রপৌত্র, সেই যৌবনময়, সুদর্শন, এবং আততায়ীর হাতে নিহত ফার্গাস কিলপ্যাট্রিকের, যার সমাধি কেউ বা কারা রহস্যময় ভাবে খোঁড়াখুঁড়ি করেছিল, যার নাম খচিত আছে ব্রাউনিং আর হুগোর পদ্যে, যার মূর্তি এখনো শাসন করছে চারদিকে লাল বাদায় ঘেরা একটা ধূসর পাহাড়ে।"

> কিলপ্যাট্রিক ছিলেন ... ষড়যন্ত্রকারীদের উজ্জ্বল এবং মহান নেতা ... মারা গেলেন সেই গৌরবময় বিপ্লবের ঠিক পূর্বমুহূর্তে যে বিপ্লব পরিকল্পিত এবং রচিত তাঁরি হাতে, তাঁরি স্বপ্ন দিয়ে নির্মিত। তাঁর মৃত্যুর প্রথম শতবার্ষিকী ক্রমে এগিয়ে আসছে মৃত্যুর পুরো প্রেক্ষাপটটাই ঘেরা একটা রহস্যের কুহেলী এই বীরের জীবনী লিখতে লিখতে রায়ান আবিষ্কার করল যে ওই কুহেলী পুলিশী তদন্তের সীমানা ছাড়িয়ে আরো বহু অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ... (কিলপ্যাট্রিক) খুন হয়েছিলেন একটা থিয়েটারে ব্রিটিশ পুলিশ কোনোদিনই খুঁজে পায়নি হত্যাকারীকে ঐতিহাসিকেরা দাবি করেন ... পুলিশ নিজেরাই তাঁকে খুন করিয়েছিল। রহস্যের গোলকধাঁধার অন্যান্য দিকগুলো ... অনেকটা বৃত্তের মত বহু দূরবর্তী কালের এবং বহু দূরবর্তী অঞ্চলের সব ঘটমানতাকে তারা যেন একত্রিত করছে, পুনরাবৃত্ত করছে। একটা শীলমোহর করা এমন চিঠি পুলিশ খুঁজে পেয়েছিল যাতে তাঁকে বিপদ থেকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল ... যেন জুলিয়াস সিজার ...। সিজারের স্ত্রী কালপুর্নিয়া স্বপ্ন দেখেছিলেন সিনেট থেকে সিজারের নামে উৎসর্গ করে দেওয়া একটা স্তম্ভ ভেঙে পড়ার কিলপ্যাট্রিকের মৃত্যুর ঠিক আগে আগে এই মিথ্যা গুজব ছড়িয়েছিল, কে ছড়িয়েছিল জানা যায়নি, যে কিলগার্ভানের গোল স্তম্ভ ভস্মীভূত হয়েছে ... তিনি (ফার্গাস কিলপ্যাট্রিক) জন্মেছিলেন কিলগার্ভানে। জুলিয়াস সিজার এবং একজন আইরিশ ষড়যন্ত্রকারীর কাহিনীর ভিতর এইসব মিল, এইসব সমান্তরালতা (এছাড়া আরো আছে) রায়ানকে চিন্তাগ্রস্ত করল, রায়ান ভাবতে শুরু করল সময়ের একটা সম্ভাব্য গোপন ছকের অস্তিত্তের কথা, যা একটা পুনরাবৃত্ত গতিপথের গোলকধাঁধা। ... এই বৃত্তাকার ভুলভুলাইয়া থেকে তাকে উদ্ধার করল একটা আশ্চর্য আবিষ্কার ... কিলপ্যাট্রিকের মৃত্যুর দিন তাঁর সঙ্গে বলা একজন ভিখিরির কিছু কথা — কথাগুলো যেন আগে থাকতেই সেক্সপিয়ারের *ম্যাকবেথ* দ্বারা পূর্বনির্দ্ধারিত। ইতিহাস ইতিহাসকে অনুকরণ করছে এটাই যথেষ্ট বিস্ময়কর ছিল, এবার সাহিত্যকে অনুকরণ করছে — এটা অভাবনীয় ... রায়ান খুঁজে পেল যে নোলান, বীর ফার্গাস কিলপ্যাট্রিকের সবচেয়ে পুরোনো সঙ্গী, সেক্সপিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাটকগুলোকে গেইলিকে অনুবাদ করেছিলেন যার

[১৪] ঠিক কাফকার ক্ষেত্রে যেমন, বোরহেস থেকে এই পড়াটাও তাই, কোনো দাযিত্বশীল গম্ভীর অনুবাদ নয়, একটা যথেচ্ছ পাঠ।

মধ্যে একটা *জুলিয়াস সিজার*। রায়ান আরো পেল ... নোলানের একটা নিবন্ধ যার বিষয় ... একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে নাটকের আকারে উপস্থাপনা, যাতে প্রয়োজন পড়ে হাজার হাজার অভিনেতা ...। আর একটা নথী, এটাও অপ্রকাশিত, থেকে সে জানতে পারে, শেষের মাত্র কয়েকদিন আগে, কিলপ্যাট্রিক, শেষ মিটিং-এর সভাপতি হিশেবে, একজন বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুদণ্ডে সাক্ষর করেছিলেন, যার নাম মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে সমস্ত দস্তাবেজ থেকে। রায়ান ... শেষ অব্দি, কোনোক্রমে, রহস্যের কুহেলীটা ভেদ করতে পারে।

বিশ্বাসঘাতকটিকে খুঁজে বার করার তদন্তের ভার নোলানকে দিয়েছিলেন কিলপ্যাট্রিক, সেই মিটিং-এ নোলান ঘোষণা করলেন যে ওই বিশ্বাসঘাতক, যার জন্যে বিপ্লব বারবার ব্যার্থ হচ্ছে, সে আর কেউ নয়, কিলপ্যাট্রিক নিজেই।

তিনি নিজের মৃত্যুদণ্ডে সাক্ষর করলেন, কিন্তু এই ভিক্ষা চাইলেন যে তাঁর শাস্তি যেন দেশের কোনো অমঙ্গল না করে। আর তখন নোলান প্রস্তুত করলেন তার এই বিচিত্র পরিকল্পনা। কিলপ্যাট্রিককে আয়ারল্যান্ড দেবতা করে ফেলেছিল। তাঁর এই কেলেঙ্কারির বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহও বিপ্লবকে বিনষ্ট করে দিত নোলান তাই এমন একটা প্রস্তাব দিলেন যাতে বিশ্বাসঘাতকের এই মৃত্যুদণ্ডটাই দেশের জাগরণের একটা হাতিয়ার হয়ে ওঠে। প্রস্তাব দিলেন যে শাস্তিপ্রাপ্ত মানুষটির মৃত্যু ঘটবে একজন আততায়ীর হাতে, সচেতনভাবে নাটকীয় করে তোলা একটা পরিস্থিতিতে, যা মানুষের কল্পনায় গেঁথে যাবে এবং ত্বরান্বিত করবে বিপ্লবকে। কিলপ্যাট্রিক শপথ করলেন যে তিনিও এই পরিকল্পনায় অংশ নেবেন, যা তাকে সুযোগ দেবে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং এই প্রকল্পে তাঁর নিজের মৃত্যুই হবে চূড়ান্ত উচ্ছাস, প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে দপ করে ওঠার মত।

সময়ের সঙ্গে দৌড়, তাই নোলান তার এই বহুস্তরিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিটি খুঁটিনাটি নিখুঁত ভেবে উঠতে পারছিলেন না — তিনি পরস্বাপহরণ করলেন, আর একজন নাট্যকার থেকে, ইংরেজ তাই শত্রু উইলিয়ম সেক্সপিয়ার থেকে। *ম্যাকবেথ* থেকে, *জুলিয়াস সিজার* থেকে তোলা দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটালেন নোলান। এই সুবৃহৎ নাট্যকাণ্ডের উণ্মুক্ত এবং গোপন রূপারোপ চলল একাধিক দিন ধরে।
অতঃপর, দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী কিলপ্যাট্রিক প্রবেশ করল ডাবলিনে, আলোচনায় অংশ নিল, প্রার্থনায়, অভিনয় করল, তিরষ্কার করল, সমবেদনা জানাল, আর এই প্রতিটি ভঙ্গী, ক্রিয়া, ব্যবহার, যা দেশপ্রেমিক কিলপ্যাট্রিকের গৌরবে উজ্জ্বল, আগে থেকে নিশ্চিত ভাবে নির্দ্ধারিত করে রেখেছিলেন নোলান। শত শত অভিনেতা হাত মেলালেন এই নাট্যকাণ্ডে কারুর কারুর ভূমিকা বেশ জটিল, কারুর বা এক মূহুর্তের।
যা তারা করল, যা তারা বলল তা সবই এখন ইতিহাসের পাতায়, আয়ারল্যান্ডের আবেগিত স্মৃতিতে। কিলপ্যাট্রিক, সূক্ষ্ম খুঁটিনাটিতে পূর্বনির্দ্ধারিত তার নিয়তির প্রবাহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে — যে স্রোত একই সঙ্গে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে এবং নিশ্চিহ্ন করবে — বারংবার সমৃদ্ধতর করে তুললেন তার নিজেরি বিচারক নোলানের সৃষ্টিকে, রচনাকে, স্বতঃপ্রণোদিত ক্রিয়ায় শব্দে বাক্যে। ফলতঃ, এই জনাকীর্ণ নাটক সময়ের শরীরে ফলেই চলল, যতক্ষণ না, ১৮২৪-এর ৬-ই অগাস্ট, একটা পূর্বনির্দ্ধারিত থিয়েটার বক্সে, অন্ত্যেষ্টির যবনিকা যেন লিঙ্কনের ইতিহাসের পূর্বাভাস, একটা বহুপ্রতীক্ষিত বুলেট তাঁর বক্ষস্থলে প্রবেশ করল, সেই বীরের এবং বিশ্বাসঘাতকের — তিনি, দুটি রক্তমোক্ষণের অন্তর্বর্তী কালে কোনোক্রমে উচ্চারণ করে উঠতে পারলেন পূর্বনির্দিষ্ট কয়েকটি শব্দ।

> নোলানের কাজে তাঁর সেক্সপিয়ার থেকে অপহৃত অংশগুলোই সবচেয়ে কম নাটকীয়। রায়ানের সন্দেহ যে লেখক সচেতন ভাবেই তাদের গ্রথিত করেছিলেন যাতে ভবিষ্যতে কেউ কোনোদিন সত্যটাকে আবিষ্কার করতে পারে। রায়ান বুঝতে পারে যে সে নিজেও নোলানের পরিকল্পনারই একটা অংশ ... অনেকানেক দ্বিধাগ্রস্থতার পর, সে সিদ্ধান্ত নেয় তার আবিষ্কারকে নৈঃশব্দ্যে গোপনে রেখে দেওয়ার। একটা বই লেখে সে, বীরের সম্মাণে উৎসর্গ করে, যে ক্রিয়াও, যতদূর সম্ভব, পূর্বনির্দ্ধারিত ছিল।

যে কোনো উচ্চতম মানের সাহিত্যক্রিয়ার মত এই গল্পটাও জটিল, নিবিড় এবং বহুমুখী। আমাদের আলোচনার আরম্ভ হিশেবে আমরা প্রথমেই বেছে নিচ্ছি সেই দুজনকে যাদের অভ্যন্তরে ঘটে উঠেছে সমস্ত আলোচনাগত পারস্পরিকতা, ডিসকার্সিভ ইন্টারাকশন — নোলান এবং রায়ান, ভূত এবং বর্তমান। প্রকৃত প্রস্তাবে এরা দুজনই এই গল্পের নায়ক, প্রোটাগনিস্ট, গল্পের অভ্যন্তরে যারা রূপারোপ করেছে এবং বাস্তবায়িত করে তুলেছে সমস্ত ঘটনা এবং মায়া, ফ্যাক্ট এবং ফিকশন। এই ক্রিয়ায় তারা দুজন পরস্পর-সম্পর্কিত, যে সম্পর্ক কাজ করেছে সময়ের পাঁচিল ও পরিখা অতিক্রম করে।

রায়ানকে তার সন্ধানে চালিত করে চলে বিপ্লবের সঙ্গে তার একাত্মতার আবেগ। যে আবেগ তার চোখে তার প্রপিতামহকে বীর করে, সম্মানীয় করে। তারি মত এই আবেগের অংশীদার নোলান-ও, সেই শান্ত দেশপ্রেমিক যোদ্ধা। কিন্তু, রায়ানের দুর্ভাগ্য যে তাকে এটা আবিষ্কার করতে হল, তার প্রপিতামহ তা নয়। তাকে সে ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছে বিশ্বাসঘাতক বলে।

কিন্তু, রায়ান আর নোলানের একদেশতা শুধু এটুকুই নয়। তারা উভয়েই অংশীদার একই জ্ঞানভাণ্ডারের — ইতিহাস, সেক্সপিয়ারের সাহিত্য, সুইৎসারল্যান্ডের সামাজিক সামগ্রিক গননাটক *ফেস্টস্পিয়েল* — এই সবকিছু, তারা দুজনেই জানে। এবং সেই জানাকে ঘটনার বাস্তবতার নানা খুচরো টুকরো ডিটেইলস-এর সঙ্গে মিলিয়ে উঠতে পারে দুজনেই। তাদের স্থাপনা করেছিল নোলান, পাঠ করেছিল রায়ান।

বিশ্বাসঘাতক খুঁজে বের করার অনুসন্ধানও চালিয়েছিল তারা দুজনেই। প্রথমবার নোলান, পরের বার রায়ান। যে পাথুরে পথ দিয়ে নোলান হেঁটেছিল, সেই একই পাথরে পাথরে হোঁচট খেতে খেতে এগোতে হয়েছিল রায়ানকেও। একই আবিষ্কার — দুজনেরি। তারপর একই গোপন করে ফেলা। এবং আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি একই আবেগের আদেশে। আলোচনার জগতে, ডিসকার্সিভলি, রায়ান এখানে নোলানের উত্তরাধিকার। কিলপ্যাট্রিকের নয়। শুধুমাত্র একটা জীববিজ্ঞান, একটা জীববিজ্ঞান মাত্র, যা তার আর নোলানের মধ্যে কিলপ্যাট্রিককে প্রবেশ করতে দেয় — আর সেই জীববিজ্ঞানকে অবশ্যই ঘৃণা করেছিল রায়ান, নোলান আর তার ওই যৌথ-আবিষ্কারের পরে।

অনুসন্ধান এবং তার পর তার ফলশ্রুতিতে রায়ানের ওই পূর্বনির্দ্ধারিত খুঁজে পাওয়া এবং সচেতন লুকিয়ে-ফেলা — এই সেই পদ্ধতি যার অভ্যন্তরে রায়ান তার বংশলতিকাকে হারিয়ে ফেলেছিল, তার জীববৈজ্ঞানিক বংশলতিকাকে। তার উত্তরাধিকারকে। তার বাবা ঠাকুর্দা ঠাকুর্দার বাবা হয়ে প্রবাহিত তার উত্তরাধিকারকে।

তার কুলীন পার্বত্য উচ্চতায় লম্বমান মূর্তির পাথুরে ধূসরতার উত্তরাধিকারকে। বীরত্ব আর বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমিকতায় যা ধূসর। এটা হারিয়ে ফেলল রায়ান। এবং পুনঃস্থাপিত হল তার বিদ্যার উত্তরাধিকারে, ডিসকার্সিভ লিনিয়েজে। তার আবেগউজ্জ্বল আসল উত্তরাধিকারকে খুঁজে পেল, তার আর নোলানের বিদ্যায় বিধৃত, টকটকে জ্যান্ত লাল জলাভূমিতে গাছে আর জলে মাখামাখি হয়ে, যে লাল বাদাবন ঘিরে রাখত ধূসর পাহাড়ে স্থাপিত কিলপ্যাট্রিকের পাথুরে মূর্তিকে। আইরিশ বিপ্লবের আবেগে লাল বাদাবন।

গল্পটাকে আরো আরো বিশদ করে তোলা যায় গিল্ট আর সাপ্রেশন, অপরাধবোধ আর গোপনীকরণের মডেলে। সে দিকে আমরা আর এগোব না। আমরা শুধু আমাদের ডিকলোনাইজেশন নামক পাঠ-রচনা-পুনঃপাঠের পদ্ধতির ফ্রেমে পড়তে চাই গল্পটাকে। যা আমাদের দেখাতে চায় যে একটা লেখকের ভূমিকা সবসময়ই থাকে দোলাচলে, নড়ে বেড়ায় বীর আর বিশ্বাসঘাতকের সাদা কালো দুটো ভূমিকার

মাধ্যমিক সব বিন্দুতে। লেখক তার লেখাকে যে ভূমিকা পালন করাতে চায় — তার ইচ্ছিত অর্থ, এবং শেষ অব্দি বাস্তবায়িত তার চূড়ান্ত অর্থ যা রূপ পায় পাঠকের বাস্তবতার ভূমিতে — এই দুটোর ভিতর সবসময়ই একটা লুকোচুরি চলতে থাকে। এই এলোমেলোপনার আশ্রয়ে গজিয়ে ওঠে ছত্রাক — বেজন্মারা — দিফেরঁদরা, যারা বাসনা আর বাস্তবতার মধ্যে বায়ুভূত নিরালম্ব।

দিফেরঁদদের লিপিবদ্ধ করেছিল নোলান।

কিছু ইঙ্গিত, কিছু খোঁচ, কিছু সন্দেহ — কিছু ফাঁক যাদের কিছুতেই মেটানো যায়না — কিছু শূন্যস্থান যাদের পূরণ করবে ভবিষ্যদ্বর্তী রায়ান। যার মহান প্রপিতামহের জীবনকে সে খুঁজছিল এবং শেষ অব্দি জানতে পেরেছিল যে সেটা ততটা মহান নয়।

নোলান চেয়েছিল বিশ্বাসঘাতককে উন্মোচিত করতে, তারপর, তার রচনায় উত্তেজিত করে তুলতে কোনো যোগ্য পাঠককে, এক্ষেত্রে সেটা রায়ান, যাতে সে পুনরুন্মোচন করতে পারে ওই আবরণ, এবং তারও পর যাতে সে রহস্যকে পুনরাবরিত করে রাখতে পারে। রায়ান ঠিক তাই করেছিল যা নোলান চেয়েছিল যে সে করুক। ওই ফাঁকগুলো ওই খামতিগুলো, দিফেরঁদগুলো যোগান দিয়েছিল সেই কন্টেক্সট যা থেকে রায়ান তার যাত্রা তার পাঠ শুরু করতে পারে। শুরু করতে পারে তার ডিসকার্সিভ জার্নি। এবার রায়ান নির্মাণ করে তুলেছিল ওই কন্টেক্সট-এর মানানসই টেক্সট — ফার্গাস কিলপ্যাট্রিকের জীবনী — যা লেখা হয়েছিল ওই দিফেরঁদদের ওই কন্টেক্সট-এ জায়গা বানিয়ে দিতে গিয়ে। যেমনটা নোলান চেয়েছিলেন। এটা সত্যি যে কোনো রায়ানের ক্ষেত্রেই যে ওই যাত্রা শুরু করে এবং সম্পূর্ণ করে উঠতে পারে। যার সেই যোগ্যতা আছে শুরু এবং সম্পূর্ণ করার।

রায়ান, প্রকৃত অর্থে, নোলানকে উল্টেছিল, ইনভার্ট করেছিল। নোলানের পিতারিক্ত বেজন্মা দিফেরঁদরা তাদের বাবা খুঁজে পেয়েছিল রায়ানের, নোলানের বিদ্যাগত উত্তরাধিকারীর, ডিসকার্সিভ ইনহেরিটর-এর, টেক্সট-এ, রচনায়।